নারী

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

সরস্বতী লাইব্রেরী
কলেজ স্কোয়ার ঈষ্ট, কলিকাতা
১৩৪৭ সন

প্রকাশক : শ্রীঅজিতকান্তি দাস
“অর্চ্চনা”
পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা

মূল্য—১৲ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

লেখিকার নিবেদন

বিগত ২।৩ বৎসরের মধ্যে নারীসমাজবিষয়ক আমার কয়েকটি প্রবন্ধ "যুগান্তর", "জয়শ্রী" ও "মন্দিরা" পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকে সেইগুলিই একত্র সন্নিবেশিত করিলাম। ইহার মধ্যে কেবল "বিবাহ-সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা।

শিশুকাল হইতেই আমার মানসপটে আমাদের সমাজে নরনারীর ব্যবস্থার বৈষম্যগুলি আশ্চর্য্যভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং বুঝিয়া বা না বুঝিয়া অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়াছি। উত্তরকালে নারী সমস্যা লইয়া বহুবিধ বিতর্ক ও আলোচনা কাণে পশিয়াছে, এবং পুস্তকাদি পাঠ করিবার সুযোগও মিলিয়াছে। নিরপেক্ষভাবে সেগুলিকে বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই সমস্ত চিন্তা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মন্থন করিয়া নারীর যে আদর্শ রূপটি আমার মনের মধ্যে উন্মেষিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ সেগুলি একত্রভাবে সমাজের সম্মুখে নিবেদন করিবার ইচ্ছা হইল। আশা এই যে—বর্ত্তমান দিনে যখন আমাদের সমাজে নারীর সামাজিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোড়ন চলিতেছে, কিন্তু নানাবিধ মতবাদের পরীক্ষায় শুধু আবর্ত্ত ফেনায়িত হইয়া উঠিয়াছে, কোনও স্থায়ী রূপ পরিগৃহীত হয় নাই,—এই দিনে নিজের জীবন সম্বন্ধে নারীর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী যদি সমাধানের পথে কোনও সহায়তা করিতে পারে।

যদি এই আশা কিঞ্চিন্মাত্র সফল হয়, আমাদের শিক্ষিত ও চিন্তা-শীল নরনারীর অন্তরে যদি এই রচনাগুলি কোনও রেখাপাত করিতে পারে, তবেই পুস্তকখানিকে সার্থক মনে করিব। ইতি

বরিশাল,
জন্মাষ্টমী, ১৩৪৭ সন

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

—নারী—

ত্রয়ী

উর্ব্বশী

প্রথম প্রভাত। ঝলমল ধবণী, উচ্ছল সাগবেব জল, মদিব বসন্তানিল। ফলে, পুষ্পে, মধুকরেব গুঞ্জবণে বনানী আলোকিত, তরঙ্গিত। তাহাব মাঝখানে দাঁড়াইল নূতন যৌবনবেগ অঙ্গে ধবিয়া সজীব সবল পুরুষ, দাঁড়াইল নাবী। নাবীব অধবে বক্তরাগ, নয়নকোণে উত্তপ্ত বহ্নিশিখা, বক্ষে পবিপূর্ণ মদেব পাত্র, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিযা সুবাব ধাবা বহিয়া যাইতেছে।

পুরুষেব দৃষ্টি আসিয়া পড়িল তাহাবই উপব—অপূর্ব্ব মাধুবী, অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল। নাবী কৃষ্ণপক্ষ্মচ্ছায়াস্নিগ্ধ চোখে কটাক্ষ হানিয়া সাড়া দিল। বনানী মর্ম্মবিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কোকিলেব ঝঙ্কাব উদ্দামতব হইয়া বাজিল, ফুলেব সৌবভ গাঢ়তব হইয়া ঘনাইয়া আসিল,—পুরুষের বুকের রক্ত উত্তপ্ত আবেগে ফুলিয়া উঠে, নাবী বিজয়গর্ব্বে,

আনন্দে, আবেশে আত্মহারা। দুর্নিবার আকর্ষণে, দুঃসহ পুলক-চঞ্চলতায় দুইজনে কাছাকাছি আগাইয়া আসিল,—আবও কাছে, আরও কাছে।

মনে হইল, বাঁচিয়া থাকিবাব চবম সার্থকতা এই। আকাশেব সকল আলো, বাতাসের সকল নিবিড় স্পর্শ, ধরণীর স্থূল সবসতা, পত্রপুষ্পেব সমস্ত বং কেন্দ্রীভূত হইয়া মিলিয়াছে আজি এই পবম-ক্ষণটিতে। পুরুষ অধীব আনন্দে বক্ষোলগ্নাব মুখের পানে চাহিয়া বলে,—পবাশু কবিয়া আমাকে নূতন জীবন দিয়াছ। নাবী তন্বুলতা লীলায়িত করিয়া হাসিব বঙ্গে ফাটিয়া পড়ে, মনে মনে উত্তব দেয়,—এইতো আমাব জীবনেব একমাত্র কাজ। তোমার বীবত্বকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য কি অস্ত্রই না ধবিয়াছি।

দিন যায়, পুরুষ নারীর জীবন কাটিয়া চলে বাধাবন্ধহাবা বিচার-বিহীন উদ্দাম লীলায়। ফুল ফুটে, মধুকর ঝাঁকে ঝাঁকে আসে, পরাগ তুলিয়া লইয়া ফুলে ফুলে মিশাইয়া দেয়। যেখানে নারী, সেখানে পুরুষ, সেখানেই অঙ্গে অঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া যায়, শিবায় শিরায় আগুন জ্বলিয়া উঠে। উদ্বেল উল্লাসে পবস্পর দিশাহারা।

কিন্তু এত আনন্দ আব সহে না, দিনের পব দিন যায়, শ্রান্তি আসে। পুরুষ অবসন্ন হইয়া পড়ে, নারীর দেহে তাহাব যেন অরুচি ধরিতে চায়, সে বাহিরেব দিকে আঁখি ফিবায়। নাবী ক্লান্ত হইয়া ভাবে,—এই ছন্নছাড়া জীবনে সুখ কই? পুরুষকে জয় কবিয়া কবিয়া তো আকণ্ঠ ভবিয়া লইয়াছি, কিন্তু তাহাতে বুক তো ভরিল না! শুধু পাওয়া, কেবল পাওয়া, ক্ষণিকের পাওয়া, ইহা লইয়া আমার কি

হইবে? দেওয়ার ব্যাকুলতায় হৃদয় যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! সর্ব্বস্ব দান করিয়া চিবতরে আপন কবিয়া লইব।

লক্ষ্মী

হাজাব বছর কাটিয়া গিয়াছে। নরনাবী দুইজনে মিলিযা বাঁধিয়া তুলিয়াছে নিরিবিলি আবামের ঘব। কোমল শ্যামল দুর্ব্বাদলে আচ্ছন্ন আঙিনাখানি, দূরে আম্রবনচ্ছায়ায় শান্ত হাওয়া বহিয়া চলে, শরতেব সোণাব আলো দুয়ারেব ফাঁক দিয়া ঘবখানি উজ্জ্বল করিয়া তোলে। নাবী আশ্রয় লইল দুয়ারেব এধাবে, পুরুষ ওধাবে অথবা উভয়তঃ।

সকালবেলা সুখশয্যা ছাড়িয়া নাবী ওঠে, সংসারের সমস্ত ভার স্নেহহস্তে তুলিয়া লয়, প্রিয়তমেব তুচ্ছতম আনন্দ-বিধানেব আয়োজনে ডুবিয়া পড়ে। আপনাব কথা মনে করিবাব সময় তিলমাত্র নাই। দিনমান কাটে, বিশ্রামেব অবসবে কেবলই প্রতীক্ষা কবিয়া থাকে, কর্ম্ম-ক্লান্ত পুরুষ তাহার সেবাব পূজা গ্রহণ কবিতে নীড়ে আসিয়া পশিবে কখন্? সন্ধ্যাবেলা সযত্নে প্রদীপখানি আড়াল কবিয়া তুলসীতলায় সাজাইয়া দিয়া দেবতাব চবণে প্রণাম জানাইয়া কামনা কবে দয়িতের কল্যাণ।

নাবী ভাবে,—কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! জীবনের কি সুন্দর সার্থকতা! যাহাকে ভালোবাসি, তাহার পায়ে নিজেকে একান্তভাবে বিলাইয়া দিয়াই আমাব জীবন যথার্থভাবে ভরিয়া উঠিতেছে। আর কিছু প্রয়োজন নাই, আর কোনও উদ্দেশ্য নাই, কেবল আমার সারা দেহমন মথিত কবিয়া অমৃতভাণ্ড পূর্ণ কবিয়া থাক্ পুরুষের প্রতি ভালোবাসা।

নারী

পুরুষ আরামের নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে,—আমার জীবনেব অবসাদ দূর করিবাব অমৃত প্রলেপ শুধু তুমিই জান, তোমাকে লাভ করিয়া আমি সুখী হইয়াছি। যুগে যুগে তুমি বাঁচিয়া থাক, কল্যাণি!—সকরুণ স্নেহে বাবেক তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লয়।

আবাব পুরুষ চলিয়া যায় পুরুষেব অসংখ্য কাজে, নাবী ডুবিয়া য়ায সংসাবেব অন্তবালে।

মাঝে মাঝে অন্যমনে নাবী ভাবে, পুরুষেব বাহিরে এত কি কাজ? বিপুল জগৎকে দূবে ত্যাগ কবিয়া ছোট এই সুখনীড়খানিতে বাঁধা পডিয়া আছে, তাই নাবীব মনে জগতেব দাবী আসিয়া পৌঁছায় না, পুরুষেব কাজ তাব কাছে ঠেকে আশ্চর্য্য, হৃদয়ঙ্গম কবিতে পাবে না সে। তাহাব অখণ্ড জগৎখানিব কেন্দ্র হইযা বিবাজ করিতেছে পুরুষ, পুরুষেব সমগ্র জীবনেব ধ্রুবতাবা হইয়া সে-ও কেন প্রতিষ্ঠা পায় না, তাই তাব বুকে ব্যথা বাজে।

কিন্তু সে ভর্ৎসনা কবে না, অভিমান কবে না, কেবল বলাব অতীত গোপন ব্যথায় নীববে অঞ্চলপ্রান্তে নযনজল মুছিয়া লয়।

কর্ম্মবহুল জীবনেব অবসাদ ঝাড়িযা ফেলিবার আশায পুরুষ নাবীর দিকে তাকাইয়া যদি দৈবাৎ সে-অশ্রুজল দেখিতে পায়, তাহাব অর্থ বোঝে না। স্নিগ্ধহাসিটুকু লাভ কবিবাব আগ্রহে আসিয়াছিল, পবিবর্ত্তে অর্থহীন ক্রন্দন দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ভাবে,—এত দিই, তবু উহাব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না? আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া লইবার মত এত সঙ্কীর্ণ মন কেন?

নিরুপায় নারী মর্ম্মবেদনায় আকুল হইয়া নিভৃতে আছড়াইয়া মরে। মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না,—তোমার ভালোবাসাকেই যে জীবনের একমাত্র সার বলিয়া জানিয়াছি, ইহার পূর্ণতায় বঞ্চিত হইলে বাঁচি কি করিয়া ?

জীবন কাটিতে থাকে। পুরুষ স্বচ্ছন্দে আরাম উপভোগ করে, কিন্তু প্রিয়ার সঙ্গে মনের বন্ধন কেমন শিথিল হইয়া যায়, অবজ্ঞায়, বিক্ষোভে ভাবে—ও নিতান্ত অবোধ। ও আমার কিছুই বোঝে না।—নারী হৃদয়ের মধ্যে শূন্যতা অনুভব করিতে থাকে,—পুরুষকে সারা হৃদয় দিয়া ভালোবাসিয়াও নিজের সমগ্র সত্তা ভরিয়া উঠে না যে।

অনন্ত আকাশের দিগন্তব্যাপী নীলিমার দিকে নারীর চোখ গিয়া পড়ে, আপনার ক্ষুদ্র গৃহখানির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীরেখা আর উদার বিশ্বের অপূর্ব্ব পূর্ণতার ছবি পাশাপাশি বড় বিসদৃশ হইয়া দেখা দেয়। ক্ষণেকের তরে পুরুষের রূপ ভুলিয়া গিয়া অরূপের স্পর্শে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়।

শিবানী

আরও এক যুগ পার হইয়া গিয়াছে। কুটীরের বেড়াখানি আল্‌গা হইয়া গিয়া আজ হইয়াছে ঘরে বাহিরে একাকার। নারীর গোপন অন্তঃপুরে জগতের আলো পশিয়া সব উদ্ভাসিত, উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। সেই আলোতে নিজের পানে চাহিয়া অবাক্ বিস্ময়ে নারী দেখে, কি অপার্থিব মহিমময় পরিপূর্ণ রূপ তাহার।

নারী

নারী আজ স্থান লইয়াছে ঘবেব অঙ্গনে ও জগতের মুক্ত রাজপথে, পুষ্পবনেব অন্তরালে ও উন্মুক্ত প্রান্তবে, খিডকিব পুকুরঘাটে ও জনহীন সমুদ্রসৈকতে, নিঃসঙ্কোচ,—যেমন চলিয়াছে পুরুষ। আজ অবারিত আলোকের মধ্যে পুরুষকে যথার্থভাবে দেখিতে পাইয়া সে অনুভব করিল,—ওতো আমাবই মত মানুষ! আমাব সমস্ত জীবনখানি অধিকার করিয়া লইবাব মত যোগ্যতা উহার কোথায়?—জীবনকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিবার আশায় পুরুষেব দিকে তাকাইয়া সে আব আজ আশ্বাস পায় না। সার্থক বিকাশেব পথ খুঁজিয়া লইবার জন্য সে আজ সন্ধান কবে অসীম আকাশের বুকে আব আপনার অন্তরাত্মায়।

সন্ধ্যাব অন্ধকাব ঘনাইয়া আসে, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে অফুরন্ত কর্ম্মপ্রবাহেব অবসানে নাবী বাবেক আসিয়া উন্মুক্ত সাগবতটে বসে, দূর নক্ষত্রলোকেব রহস্যময় শিখাব দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া চাহিয়া আত্মাব বহস্যকে উদ্ভাসিত কবিয়া লইতে চায়।

পুরুষ আপনাব কর্ম্মশেষে তাহাব পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, সহসা সাড়া পায় না। ধীবে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা কবে,—কি ভাবিতেছ?

নাবী চক্ষু তুলিযা তাহার চোখেব দিকে তাকায়, তাহাব মধ্যে খুঁজিয়া ফেবে পুরুষটিকে নয়, মানুষটিকে।

পুরুষ সস্নেহে জিজ্ঞাসা কবে,—কি ভাবিতেছিলে? আমাব কথা?

নাবী বলে,—না।

পুরুষেব আত্মদর্পী হৃদয়ে ক্ষণতরে ব্যথা লাগে। মৌনী হইয়া ভাবে,—আমাকেও ছাড়াইয়া নাবীর আবাব কাম্য কি আছে? আমার

ভালোবাসাই কি উহার জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়?—নিঃশ্বাস ফেলে, নারী আজ তবে আমাকে আর ভালোবাসে না!

নারী বুঝিতে পারে, গভীর প্রেমে তাহার হাতখানি তুলিয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে,—তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু তোমার আমার ভালোবাসাই শুধু তোমাকে আমাকে জীবনের পূর্ণতা আনিয়া দিতে পারে না। আরও বৃহত্তর অনুভূতির প্রয়োজন আছে। আত্মার অন্তরে অন্তরে অনুভব করি আজ সেই বৃহতের আহ্বান।

পুরুষ অপরিসীম বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ভাবে,—সে আহ্বান কি এ-ও শুনিতে পায়? আমি জানিতাম, শুধু আমারই কাণে পশে!

জীবন-সমস্যায় বিক্ষুব্ধ, বিপর্য্যস্ত, জর্জ্জরিত হইয়া পুরুষ অবসাদে ডুবিয়া আসে, কূল কোন্‌দিকে জানা নাই, আশ্রয় করিবে কাহাকে? দুর্ব্বহ ভারে বীরদেহ ভাঙ্গিয়া আসে বুঝি! নারী আসিয়া এমনকালে পাশে দাঁড়াইয়া শুধায়,—কি ভাবিতেছ?

পুরুষ হতাশ্বাস-হৃদয়ে ভাবে,—অবলা কি সাহায্য আমাকে দিবে?

আত্মার আলোতে নারীর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, বরাভয়হাস্যে প্রসন্ন মুখে বলে,—আমার দিকে চাহিয়া দেখ দেখি, আমি কি তোমারই ছায়া, না স্বতন্ত্র কায়া? ছায়া যদি হইতাম, তবে তোমার বিলোপে আমারও বিলোপ হইত। কিন্তু আমি যে তোমারই মত সমগ্র আর একটি মানুষ, তোমার একক শক্তিকে দ্বিগুণিত করিতে আসিয়াছি, তোমার সাথী। চিনিতে পার?

পুরুষ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখে,—তাই তো, এ তো আমি নয়!

—দুর্গম বিজন পথে আব একটি সবল সহযাত্রীব সন্ধান পাইয়া তাহার পথেব অন্ধকাব স্বচ্ছ হইয়া আসিল।

নাবীব হাতখানি হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া পুরুষ এবাব সোজা হইয়া পাশে দাঁড়ায়, আনন্দে, শ্রদ্ধায় সঙ্গিনীব মুখেব পানে চাহিয়া দেখে, আজ লাজকুণ্ঠিতা, ভয়বিব্রতা তাহাকে জড়াইয়া ধবিয়া পদে পদে বাধাগ্রস্ত কবিতে চাহিতেছে না, পবম নির্ভয়ে শুচিস্মিতা সম্মুখেব অন্ধকাবেব পানে দৃষ্টি মেলিয়া বলিতেছে—চল, অগ্রসব হই।

স্বর্গবাজ্য হইতে আলোকেব ঝবণা নামিয়া দুইজনের ললাট উজ্জ্বল কবিয়া দেয়।

ভারতীয় সভ্যতা ও নারী

বিষযটি অতি পুবাতন, বিশেষতঃ এই বিংশশতাব্দীব মধ্যভাগে ইহার পুনবালোচনা বড বাসি লাগে। কিন্তু দুঃখেব বিষয, আমাদের দেশে সর্ব্বত্র এখন পর্য্যন্ত বিংশশতাব্দী প্রবেশ কবে নাই, অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিদেব ঘবে ঘরেও উনবিংশ শতাব্দী বিবাজমান। তাই এই বহু-আলোচিত বিষয়টির আবও একবাব কেন, একশত বার অবতাবণা হইলেও অতিবিক্ত হইবে না, ইহাই কৈফিয়ৎ।

ভাবতীয় সভ্যতাব খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য সভ্যতাব তুলনায় ভাবতীয় সভ্যতাব শ্রেষ্ঠতা তাহাব দার্শনিক চিন্তাধাবার শ্রেষ্ঠতাব উপবে প্রতিষ্ঠিত। জগৎ-তত্ত্ব ও জগতের অতীত অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সাধনায় ভাবতবর্ষ যে গভীব ধ্যানে নিরত ছিল এবং যে বিবাট্ সত্যেব আবিষ্কাব কবিয়াছিল, তাহাই তাহাব সভ্যতাব মধ্যে অমব প্রাণেব সঞ্চার কবিয়া বাখিয়াছে—যে অমবত্বেব বলে শত শত বর্ষ পদদলিত হইয়াও সে আজও সভ্য নামে বাঁচিয়া আছে। নতুবা সভ্যতা বলিতে যে সকল জাগতিক শক্তি ও সমৃদ্ধি বুঝায়, শুধু তাহার বলে ভাবতবর্ষ জগৎপূজ্য হইতে পাবিত না। শিল্পেব ঐশ্বর্য্য তাহাব ছিল, বাণিজ্যেব সুদূব প্রসাব ছিল, গণিত-বসায়ন-আয়ুর্ব্বেদাদি বিজ্ঞানেব ভাণ্ডারে তাহাব দান অতুলনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা দ্বাবা সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ কবিবার অধিকাবী নয়, ইহা পৃথিবীর বহু প্রাচীন ও নবীন দেশবিদেশেবও আছে। সে জগৎসভায় ববেণ্য

হইয়াছে তাহার দার্শনিক সবলতা, গভীরতা ও প্রত্যক্ষ সত্যোপলব্ধিতে। এই সম্পদের মহিমাতেই জ্ঞানদৃপ্ত, বলদৃপ্ত, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রতীচ্য জগতের দৃষ্টি আজও মাঝে মাঝে ভারতের পানে শান্তির আশায় আকৃষ্ট হয়। এই ভারতীয় দর্শন শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে—জড়ের প্রচণ্ড শক্তির পশ্চাতে প্রবলতর আত্মার শক্তি বিরাজ করে, জড়প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া সেই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে ও বরণ করিতে পারিলেই মানব জীবনের পূর্ণসিদ্ধি। মানুষ বাহির হইতে দেখিতে জড়পিণ্ড, কিন্তু অন্তরে তাহার আত্মার মহিমা প্রতিষ্ঠিত, এই নরদেহেই মানুষ প্রকৃতির বন্ধনের ঊর্দ্ধে উঠিয়া প্রচ্ছন্ন আত্মাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে। দেহের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া আত্মলাভের এই সাধনাই ভারতীয় সাধনা। সে আরও প্রচার করিয়াছে, অণুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট্ গ্রহতারকামণ্ডল পর্য্যন্ত সেই পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত, তাহা দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহারই অভিমুখে গতিশীল, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি", "যত্র জীব তত্র শিব"। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে, ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর বাণী আর কল্পনা করা যায় না। নানাভাবে, নানাপদ্ধতিতে, নানামুনির মুখনিঃসৃত বাক্যে ইহাই বারে বারে স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে ঘোষিত হইয়া আসিতেছে এবং ভারতের সভ্যতার বহুমুখী ধারায় ইহাই যে প্রতিবিম্বিত হইবে, তাহা স্বাভাবিক।

কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যতিক্রমও একটি দুইটি দেখা যায়। ভারতীয় সভ্যতার তত্ত্বদর্শনের সূক্ষ্মতা, উদারতা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ইহার সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর স্থানকে একবার পাশাপাশি তুলনা করিয়া

দেখি। প্রাচীন ভারতের যাঁহাবা অনুরাগী, তাঁহারা ভারতীয় নাবীর আদর্শকেও সোচ্ছ্বাসে বন্দনা কবিয়া থাকেন, এবং যদিও আমাদের নাবীকুলের সামাজিক অবস্থার ন্যায্যতা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অনেকেরই সংশয় জন্মিয়াছে ও তীব্র প্রতিবাদ চলিতেছে, তথাপি আদর্শ সম্বন্ধে প্রতিবাদ বড একটা শোনা যায় না। বরঞ্চ, জাতীয়তাব নূতন সূচনার ফলে অতীত ভারতের সমস্ত কিছুকেই সগৌববে পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবা এবং সেই সঙ্গে ভাবতীয় নাবীর প্রাচীন আদর্শকেও মহনীয়ভাবে প্রচাব কবা একটি বীতি হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রসংহিতাকাবগণ নাবীব প্রতি যে যথোচিত সুব্যবস্থা করিয়া যান নাই, তাহা এখন অন্ততঃ চক্ষুলজ্জাব খাতিবে প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষই স্বীকার কবেন, সুতবাং সে আলোচনার মধ্যে আর যাইতে চাহি না। নতুবা আমাদেব বহুমান্য সংহিতা পুবাণাদি হইতে এত অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত কবিয়া দেখানো যাইত যে, পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমবা সেদিকে প্রবেশ না করিয়া অন্য কথা আলোচনা কবিতে চাই। জানিতে চাই, যাঁহাবা ব্যবস্থাবিধির পুঙ্খানুপুঙ্খতাকে ধামাচাপা দিয়া তাহাব পশ্চাতেব মহৎ উদ্দেশ্য ও আদর্শের স্তবগান কবেন, তাঁহাদেব সেই মহৎ আদর্শটি কি? সকলে জানি, ভাবতীয় নাবীর আদর্শ পত্নীত্ব ও মাতৃত্বেব আদর্শ, এবং অনুবাগিগণ বলেন যে, এই পত্নীত্ব ও মাতৃত্বকে সার্থক পথে উন্নীত কবিবাব জন্য প্রয়োজন সংযমেব, সেই সংযমের প্রতিষ্ঠা করিতেই ভাবতীয় শাস্ত্রকর্ত্তাগণ নানাবিধ বিধান প্রণয়ন কবিয়াছেন। —মাতৃত্ব ভারতীয় নারীজীবনেব সার্থকতম বিকাশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া

হইয়াছে অর্থাৎ প্রচাব কবা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। কারণ নারীব প্রতি ভূরি ভূবি কদর্য্য ইঙ্গিত থাকিলেও আমাদেব বিপুল শাস্ত্রভাণ্ডাবেব মধ্যে 'দেবী' 'পূজার্হা' ইত্যাদি কয়েকটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোভনীয় শব্দ যে ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাব কাবণ ঐ মাতৃত্বেবই গৌবব। "গর্ভধাবণপোষাভ্যাং তাতান্মাতা গবীয়সী" ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক মাতৃত্বই নাবীব সর্বোত্তম সার্থকতা, এই বোধেব বশবর্ত্তী হইয়া এবং এই সার্থকতাব পথ প্রশস্ত করিয়া দিবাব মানসেই যে শাস্ত্রকাবগণ নাবী সম্বন্ধে বিধিবিধান বচনা কবিযাছিলেন, তাহা মনে হয় না। কাবণ, শাস্ত্রে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত অনুশাসন যত অধিক আছে, মাতা-সন্তান সম্পর্কে তত নাই। বিশেষতঃ স্পষ্টই নির্দ্দেশ দেওযা হইয়াছে যে, স্বামী মৃত হইলে, পত্নী অপুত্রক থাকিলেও সন্তানলোভে অন্যপতি ববণ কবিবেন না। মাতৃত্বকেই সমাজেব পক্ষে প্রয়োজনীয় ও নাবীর পক্ষে কল্যাণকব বিবেচনা কবিলে সমাজপতিগণ কখনও ঐরূপ ব্যবস্থা কবিতেন না, ববঞ্চ বিধবাকে পুনর্বিবাহ কবিয়া মাতৃত্বেব অধিকাবী হইতেই প্রেরণা দিতেন। সুতবাং আমাদেব দেশে মাতৃত্বই নাবীব শাস্ত্রসম্মত প্রধান আদর্শ বলিয়া স্বীকাব কবা যায না। প্রধান আদর্শ পত্নীত্ব অর্থাৎ পাতিব্রত্য। এবং পুরুষেব অনুগত পত্নীত্ব স্বীকাব কবাইয়া লইবাব জন্যই তাহাব অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বহুমাতৃত্বেব ক্লেশকব দাযিত্ব সানন্দে ও সগৌববে বহন কবাইবাব উদ্দেশ্যে কৌশলে মাতৃত্বের জয়গান কবা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। সন্তানের জন্য নারীব সহজ আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত কবিবাব, অথবা সমাজেব পবিপুষ্টি সাধনার্থে উপযুক্তভাবে সন্তান পালনে ব্রতী করিবাব জন্য বিধান

দেওয়াব পবিবর্ত্তে পুরুষেব প্রবৃত্তির বোঝা অম্লানভাবে বহিতে ও সহিতে যাহাতে নাবী বাজী হয়, সেইদিকেই শাস্ত্রকাবগণ মনোযোগ দিয়াছেন বেশী। সুতবাং ভাবতীয় মতে পত্নীত্বই নাবী-জীবনেব চরম সার্থকতা এবং পতিপূজাই পরম পূজা। (অবশ্য কৌতুকেব বিষয় যে, এখানেও মাতৃত্বের মতই পত্নীত্বেবও সীমাবেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ স্বামী গতাসু হইলে আব অপরেব পত্নীত্বগ্রহণের অধিকাব রহিল না)। এজন্য যতদিকে যতভাবে সংযমেব চেষ্টা ও অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাহাই নাবীব কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। সংযম ও পবিত্রতা যে মানবজীবনেব একটি শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব, একথা অস্বীকাব কবিবাব ইচ্ছা আমাদেব নাই। শাস্ত্রকাবগণ এবিষয়ে যে যথোচিত মনোযোগ দিযাছেন, ইহা ধন্যবাদেবই বিষয, যদিও পুরুষেব দিক্ হইতে পতিত্ব সম্বন্ধে অনুরূপ সংযমেব অনুশাসন দিলে আবও ধন্যবাদভাজন হইতেন। কিন্তু সেকথা থাক্। নাবীকে যদি ইঁহারা সংযমেব পথে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা কবিয়া থাকেন, তবে সুখেব কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যেব বিষয়, সংযমের অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তিকে জয় করিবার বা ঊর্দ্ধমুখী কবিবাব উপদেশ নাবীব প্রতি কোথাও দেখিতে পাই না, পক্ষান্তবে, শুধু সর্ব্বতোভাবে স্বামীব মনস্তুষ্টি ও আকাঙ্ক্ষাব চবিতার্থতার জন্য নিজেকে একান্তভাবে বলিদান করিবার কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, (অন্তবকে নিস্পৃহ না কবিয়া বাহির হইতে বন্ধনেব চাপে ও শাসনেব দাপে কামপ্রবৃত্তিব প্রকাশকে প্রতিরুদ্ধ কবাব নাম সংযম নয়, উহা নিপীড়ন বা অবদমন)। আত্মার যে অত্যুচ্চ অবস্থা হইলে সমস্ত বিশ্বে ও সমস্ত ক্রিয়াতে ব্রহ্মানুভূতি

হইতে পারে এবং আহারবিহারাদি নিতান্ত দৈহিক ক্রিয়াও ব্রহ্মানুভূতিতে সাধিত হওয়া সম্ভব, সেদিকে বারেকের তরেও ভারতীয় নারীর দৃষ্টি প্রসারিত করা হয় নাই, পরন্তু একান্তভাবে স্বামিগত দেহপ্রাণ হওয়া ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্য ধর্ম্মই নাই, ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ—ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত ভক্তগণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন—ভারতীয় নারীর জীবনের আদর্শ হইতেছে কায়মনোবাক্যে যৌনজীবন যাপন করা। মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, সতীত্ব, সংযম ইত্যাদি যত কিছু আখ্যাই সগৌরবে প্রচার করা হউক না কেন, ভারতীয় নারীর শিক্ষা কার্য্যে ও কারণে মূলতঃ উহাই। ইউরোপের দৃষ্টি জড়ের ঊর্দ্ধে পৌঁছায় নাই, সুতরাং ইটালী, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশের নারীর প্রতি পত্নীত্ব মাতৃত্বের আদর্শ ও অনুশাসন বুঝিতে পারি, তাহারা জড়জগতের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া জানে, তাই সেখানে পুরুষের পরম পুরুষার্থ দৈহিক বীরত্বে ও সাম্রাজ্যবিস্তারে, নারীর চরিতার্থতা সন্তান ধারণে। কিন্তু যে ভারতবর্ষ জড়সম্পৎকে উপেক্ষা করিয়া আত্মাকে অধিকার করিবার সাধনা আবহমান কাল হইতে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, সেই ভারতবর্ষের শাস্ত্রবিধানে নারীর জন্য এমন সঙ্কীর্ণ আদর্শ কেমন করিয়া আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহা ধারণার অতীত। পত্নীত্ব এবং মাতৃত্ব নিন্দনীয় ব্যাপার নয়, উহা জীবজগতে স্বাভাবিক এবং সমাজ জুড়িয়া চিরকাল চলিতেছে ও চলিবে, পুরুষের পক্ষেও যেমন পতিত্ব ও পিতৃত্ব। কিন্তু যে ভারতীয় মন মানুষের পক্ষে (অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে) উন্নততর জীবনের সন্ধান ও

প্রেরণা জোগাইয়াছে, সংসারকে দূরে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস বরণ করিতে শিখাইয়াছে, এবং সংসারকেও ব্রহ্মদৃষ্টিতে দর্শন করিবার ইঙ্গিত দিয়াছে, সেই ভারত নারীকে আত্মোন্নতি ও আত্মলাভের সমস্ত পথ রুদ্ধ রাখিয়া কেবল পত্নীত্বের স্থূল গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া দিল কেমন করিয়া এবং কেন, তাহাই ভাবি। নারীর আত্মাতে অধিকার নাই, সে গাহিবে শুধু দেহের বন্দনা গান। সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া প্রচারিত হইল, কিন্তু নারী রহিল নরকেরই দ্বার। পুরুষের অধ্যাত্মসাধনার পথে প্রথম স্তরগুলিতে নারীর প্রতি আকর্ষণ প্রবল বিঘ্নের সৃষ্টি করে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বিঘ্ন ঠিক তেমনই ভাবে নারীর অধ্যাত্মসাধনার পথে পুরুষও যে সৃষ্টি করে, নারীর পক্ষে পুরুষও যে নরকের দ্বার, সে কথার উল্লেখ কোথাও নাই। কারণ, ভারতীয় মতে অধ্যাত্মসাধনা নারীর জন্য নয়। এই মনোভাব আমরা প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রায় সমান ভাবে দেখিয়া আসিতেছি। ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে প্রথম স্বামী বিবেকানন্দে—প্রচলিত 'কামিনী-কাঞ্চনের' পরিবর্ত্তে তিনি 'কাম-কাঞ্চনে'র বর্জ্জন উপদেশ করিয়াছেন, যাহা নরনারী উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য।

ভারতীয় দার্শনিক অনুভূতির উচ্চতা ও গভীরতার সঙ্গে ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের এই যে বৈসাদৃশ্য ও পরস্পরবিরোধিতা দেখা যায়, ইহার মূলে দুইটি কারণ অনুমিত হইতে পারে। এক,—যে সকল ঋষি নিজের অন্তর বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে করিতে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজের পুরুষ-অন্তরের

অনুভূতিগুলি লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন, নারীকে বিচার করিয়াছিলেন পুরুষেরই দিক্ হইতে, পুরুষের পক্ষে যুগপৎ লোভ ও ভয়ের সামগ্রী হিসাবে, মানুষ হিসাবে নয়। সেই জন্য সাধকের নিকট তাহাকে পরিত্যাজ্য নরকের দ্বাররূপে বর্ণিত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ—যে সব ঋষি সাধনার বলে তত্ত্বদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই গুহাবাসী, অরণ্যবাসী। সমাজের বিধি প্রণয়ন করিতেন যাঁহারা, তাঁহারা রাজসভাসমাসীন সাংসারিক বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহারা প্রতিভাশালী হইতে পারেন, কিন্তু ঋষি নহেন। সংসারকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার বাণী যদিও ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং গুহারণ্যের অন্তরাল ভেদ করিয়া মহর্ষিগণের উদাত্ত ছন্দ যদিও ভারতের লোকালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তথাপি হয়তো মর্ম্মে প্রবেশ করে নাই। তাই এই অসামঞ্জস্য। শাস্ত্রকার অর্থাৎ আইন প্রণেতৃগণ ছিলেন সকলেই ব্রাহ্মণ এবং পুরুষ, কূট রাজনীতি ও সমাজনীতি লইয়া যাঁহাদের কারবার, সুতরাং ঋষিবাক্যকে দূর হইতে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া কার্য্যকালে ব্রাহ্মণ ও পুরুষের সর্ব্ববিধ প্রভুত্ব ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিবার বিধিব্যবস্থা পাকা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র সাম্যনীতি সমাজব্যবস্থায় টিঁকিল না। নারীকে আত্মার বাণী শুনাইলে সে যদি সত্য সত্যই বৈরাগী হইয়া বসে, পুরুষের ভোগ-প্রবৃত্তি তবে অবাধ চরিতার্থতা পায় না, সুতরাং 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি'র আহ্বানকে চাপা দিয়া পত্নীত্ব-মাতৃত্বের সঙ্কীর্ণ আদর্শকেই নারীর পক্ষে সর্ব্বার্থসাধক বলিয়া ঘোষিত হইল। প্রাচীন ভারতকে

প্লেটোপরিকল্পিত আদর্শ বাষ্ট্র বলিয়া কেহ যেন ভুল না কবেন, অন্যান্য দেশেব মত এখানেও ঋষি ও বাষ্ট্রসমাজনায়ক এক ব্যক্তি ছিলেন না। সেই জন্যই ইহাব দার্শনিক তত্ত্বে ও সমাজবিধানে অনেক পার্থক্য আছে।

যাহাই হউক, ভাবতবর্ষেব দার্শনিক সমৃদ্ধি যত গৌববময় হউক, ভাবতবর্ষেব সমাজসভ্যতা লইয়া নাবীব পক্ষে গৌবব করিবাব কিছুই নাই। শাস্ত্রগ্রন্থে উচ্চাঙ্গেব উপদেশ অনেক সন্নিবেশিত থাকিতে পাবে, কিন্তু নারীব তাহাতে কি? 'নৈবাধ্যকাবিস্মহি বেদবৃত্তে।' কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, নাসিকে হবিজনেবা মনুসংহিতাব বহ্ন্যৎসব কবিযাছিল, মনে হয়, আমাদেব নাবীসমাজেব পক্ষেও উহাই শাস্ত্রসংহিতাব যথোচিত সৎকাব। ভাবতেব সাধনাব প্রতি যাঁহার যথার্থ অনুবাগ আছে, তেমন পুরুষও উহাকে অশ্রদ্ধাব চক্ষে না দেখিয়া পাবেন না। সুতবাং ভাবতীয় নাবীত্বেব মহিমা-কীর্ত্তনে যাঁহাবা তৎপব, আধুনিক যুগেও নব জাগরিত জাতীয়তাব ফলে নাবীর শিক্ষাদীক্ষা সেই প্রাচীন ভারতীয় ধাবাব অভিমুখী কবিবাব জন্য যে সব শিক্ষিত মহোদয় ও মহিলাগণ ব্যগ্রতাপ্রকাশ কবিতেছেন, তাঁহাদের অবহিত হইতে অনুবোধ কবি।

বিবাহ-সমস্যা

পুরুষ নারীর পরস্পরের প্রতি কামনার আকর্ষণ সেকালেও কেহ ঠেকাইতে পারে নাই, একালেও না। সমান উদ্দামগতিতে স্রোত চলিয়াছে। শুধু তাহার বাহিরের অভিব্যক্তি মাঝে মাঝে রূপান্তরিত হইতেছে মাত্র। প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক স্বার্থ এক নয়, সুতরাং প্রত্যেকের প্রবৃত্তিকে অপ্রতিহত বেগে আপন পথে চলিতে দিলে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, শৃঙ্খলা থাকে না। তাই প্রবৃত্তির মুখে লাগাম পরাইবার প্রয়োজন হইল; লাগাম পড়িল যৌন কামনার মুখেও। সেই হইতে বিবাহের সৃষ্টি। সে অনেক দিনের কথা।

কথা অনেক দিনের। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহাকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তোলা গেল না। সভ্যতার শৈশবকাল হইতে এই অনুষ্ঠানটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রথার মধ্যে রূপ পাইয়াছে, অথচ কোনটিই মানব মনের কামনার চরিতার্থতা ও উচ্চতর জীবনের পরিস্ফুরণের সামঞ্জস্য করিবার পক্ষে আদর্শ বলিয়া মনঃপূত হইতেছে না। কিন্তু না করিয়াও মানুষের তৃপ্তি নাই।

বর্ব্বরতার তিমিরঘোর কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনের রাজ্য যখন আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ করিল, অধ্যাত্মজগতের অভিনব জ্যোতি দেহের উপর ফলাইল নূতন রং, তখন নূতন আবিষ্কারের আনন্দে, নূতন আলোর ছটায় চোখ ধাঁধিয়া মানুষ দেহটাকে একেবারেই বাদ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। নরনারীর দেহের আকাঙ্ক্ষাকে অনাদর করিল, অস্বীকার

করিতে চাহিল। গড়িয়া উঠিল আমাদের দেশে ভিক্ষুসংঘ, ভিক্ষুণীসংঘ, সন্ন্যাসাশ্রম, খ্রীষ্টিয় জগতে monasteries, nunneries। যাহারা অতটা অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই, তাহারা বিবাহকে স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু কামনাকে বহুমুখী হইয়া ছুটিতে না দিয়া সংযত ও শৃঙ্খলিত করিবার জন্য ধর্ম্মের অনুশাসন দিয়া বিবাহকে ইহপরকালে অবিচ্ছেদ্য করিয়া বাঁধিয়া রাখিল। মুসলমান সমাজ ছাড়া পৃথিবীর যে কোনও সুসভ্য সমাজ তাহার দীর্ঘ বিবর্ত্তনের পথে কোনও না কোনও সময়ে বিবাহের এই অচ্ছেদ্যতাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিধান দিয়াছিল—মিশরীয়, চৈনিক, ভারতীয়, খ্রীষ্টিয় কেহই বাদ যায় নাই।

উদ্দেশ্য ভালোই ছিল, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে খাপ খায় নাই বলিয়া ফল তেমন শুভ হইল না। প্রথম প্রেরণার আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ শুকাইয়া আসিল, ভিক্ষুসংঘ monastery প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যের নিকেতনগুলি অবরুদ্ধ কামনার কদর্য্যতায় উঠিল পঙ্কিল হইয়া। ধর্ম্মপ্রবক্তা ও সমাজনেতৃগণ ভুল করিয়াছিলেন এই যে, দেহের প্রবৃত্তিকে আত্মার প্রেরণা দিয়া জয় করিবার শক্তি সকল মানুষের নাই, সুতরাং ব্রহ্মচয্যব্রত ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা হইতে পারে না। অন্ততঃ সভ্যতার স্তর তখন পর্য্যন্ত অত উঁচুতে উঠে নাই, আজও নয়।

চিরকৌমার্য্যের বিধি কুফল ফলাইল, সুতরাং হইয়া পড়িল অচল। শুধু অবিচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধন বজায় রাখিয়াই মানুষ অগত্যা সমাজের স্থিতি ও শৃঙ্খলার প্রয়াস করিল অনেককাল ধরিয়া। পারিবারিক জীবনের ভিত্তিই এই অবিচ্ছেদ্যতা এবং সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এই পরিবারগুলির সমষ্টিতে। পরিবারে পরিবারে সামঞ্জস্য রক্ষা ও

পরিবারগত সুখস্বচ্ছন্দতার দিকেই সমাজের দৃষ্টি। ইহার পিছনে তাই ব্যক্তিগত সুখদুঃখ কেমন করিয়া চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যে দুইটি পুরুষ ও নারীকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিয়া দেওয়া গেল, পুত্রকন্যা পরিবৃত হইয়া তাহারা যতদিন ঘর করিয়া যাইতেছে, সমাজের অপরাপর পরিবারের সঙ্গে পরস্পরবিহিত কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে, সমাজ ততক্ষণ নিশ্চিন্ত, সমস্ত দায়িত্ব হইতে মুক্ত। পরিবারের আড়ালে ব্যক্তির মন কাঁদিতেছে কিনা, স্বামী ও স্ত্রী সমাজবন্ধনে বাহির হইতে বাঁধা থাকিলেও প্রাণে প্রাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে কিনা, সে খবরে সমাজের প্রয়োজন নাই। পরস্পরের সংযোগ ও সান্নিধ্য পরস্পরকে হাজার নিপীড়িত করিলেও সমাজ তাহাদের প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্ন হইতে দিবে না, কারণ ইহাতে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইবে।

কিন্তু ফল ইহাতেও ভালো হইল না। সমাজ-প্রাণ তলে তলে তিলে তিলে বিষাইয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং অবশেষে এ প্রথার সংস্কারের প্রয়োজন আসিল। অনেক সুসভ্য সমাজই স্বীকার করিল—বিশেষ কোনও অবস্থায় বিশেষ বিশেষ কারণের ফলে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, সমাজের তাহাতে বাধা দেওয়া অন্যায়। খৃষ্টান জগতে—রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ইহার সমীচীনতা মনে মনে স্বীকার করিয়াও চিরাচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ততটা ভরসা না পাইয়া প্রবর্ত্তন করিল বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিবর্ত্তে বিবাহ-প্রত্যাহার (annulment of marriage), প্রোটেস্ট্যাণ্ট দল সরাসরি গ্রহণ করিল ডাইভোর্স প্রথা। রোমীয় সমাজবিধি কারণ

বিশেষে পতিপত্নীপরিত্যাগের প্রথা বহু পূর্ব্বেই অনুমোদন করিয়াছিল। ভারতবর্ষেও কোনও কোনও শাস্ত্রকার পতিপরিত্যাগ ও পুনর্ব্বিবাহের বিধান দিয়াছেন—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

এখানে একটা কথা বলা ভালো। বিবাহবিচ্ছেদ যতদিন পর্য্যন্ত স্বীকৃত না হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্তও দাম্পত্যজীবনের অসামঞ্জস্য দূর করিবার একটি উপায় পুরুষের পক্ষে ছিল—স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কোথাও সে বাধা পাইত না। কিন্তু অবিচারের কথা ও ক্ষোভের কথা যে, স্ত্রীর পক্ষে এ পথ বন্ধ। পরবর্ত্তীকালে এই যে বিচ্ছেদপ্রথা স্বীকৃত হইল, ইহাতে সমস্যা কিছু সহজ হইল বটে, কিন্তু নর ও নারীর সমান দাম্পত্য অধিকার এখনও সর্ব্বত্র আসিল না। পুরুষের পক্ষে যত সহজে ডাইভোর্সের বা পরিত্যাগের বিধান মিলিতে পারে, নারীর পক্ষে তত সহজে ব্যবস্থা হইল না।

পৃথিবীর সমাজ মোটামুটি এই পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশভেদে অল্পবিস্তর তারতম্য থাকিলেও খুববেশী পার্থক্য অনেক দেশেই নাই। (রাশিয়ার কথা মুহূর্ত্তের জন্য বাদ দিলাম, পরে বলিব)। আমাদের দেশে ব্যাপার একটু আলাদা। এখানে শাস্ত্রে এক কথা থাকে, লোকাচার থাকে অন্যরকম। কারণ, শাস্ত্রের কোনও সীমা সংখ্যা নাই, কে কাহাকে মানিবে? সুতরাং কার্য্যতঃ দাঁড়াইয়াছে এই যে, শাস্ত্রকার ক্ষেত্রবিশেষে পত্যন্তর গ্রহণের বিধান দিলেও

আমাদের দেশ এতকাল পরে শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগব মহাশয়েব প্রচণ্ড লাঠালাঠিব পবে মাত্র বিধবাবিবাহটি স্বীকার করিয়াছে,—অন্য সমস্তগুলি একদম বাদ। এবং ডাইভোর্সের নাম শুনিলে আমাদেব শিক্ষিত সমাজও আজ পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

আমাদেব দেশেব বর্ত্তমান বিবাহবীতিব মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই অনেকখানি। অভিভাবকেবা নিজ নিজ রুচি অনুসাবে বব ও বধূ মনোনীত কবিয়া দুইটি জীবনকে জুড়িয়া দিলেন। বব বধূব পবস্পবেব প্রকৃতি ও রুচিব ঐক্য হইবে কিনা, তাহা ভাবিযা দেখাব প্রয়োজন নাই। তাহাবা বিবাহেব পূর্ব্বে কেহই কাহাকে জানিবাব ও চিনিবাব অবকাশ পায না। বব হযতো একবাব কন্যাকে চাক্ষুষ দেখিতে পায, কন্যা তাহাও পায় না। অথচ এমন করিযা যাহাদেব প্রকৃত মন ও মতকে অবহেলা কবিযা সমাজে গাঁথিয়া দেওয়া হইল, আব তাহাবা কোনক্রমেই এজীবনে বিচ্ছিন্ন হইতে পাবিবে না। লৌকিক মিলনেব পবে কাছাকাছি আসিয়া হযতো দেখা গেল, দুইটি মনেব মধ্যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, তবু সে ব্যবধানকে ধামাচাপা দিয়া বাখিতে হইবে। প্রেম কোনমতেই ফুটিয়া উঠিতে পাবে না, তবু প্রেমেব ভাণ দেখাইতে হইবে চিবকাল। অপবেব অবিবেচনায অপবেব প্রেমজীবনকে এমনভাবে বঞ্চিত কবাব কল্পনাও একান্ত ক্লেশকব। সম্পূর্ণ অজানা বিবাহেব সঙ্গে সুদৃঢ অবিচ্ছেদ্যতা মিলিয়া আমাদেব সমাজজীবনে যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাব ফলে শুধু যে দম্পতীব মনেব দূবত্বই সৃষ্ট হইতে পাবে তাহা নয়, ইহাব চেয়ে আবও স্থূলতর অত্যাচাবকেও মাথা পাতিয়া লইতে হয়। যাহাব সহিত বিবাহ হইয়া

গেল, সে যদি অসচ্চবিত্র অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলেও নিবপবাধ সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে তাহাব সংস্পর্শ স্বীকাব করিয়া লইতে হইবে , নয় তো, একমাত্র পথ (পত্নীব পক্ষে) বিবাহের আবরণের আড়ালে অনিচ্ছাকৃত কৌমার্য্য লইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করা। ইহাব ফলে যদি পঙ্গু, বোগাক্রান্ত সন্তান-সন্ততিতে সমাজ ও জাতিকে দুর্ব্বল কবিয়া ফেলে, অথবা ব্যভিচাবেব গোপনস্রোতে সমাজ বিষাক্ত হইয়া উঠে, সেজন্য দোষ দিব কাহাকে ?

অজানা বিবাহেব পবে দম্পতীর মধ্যে মনেব অনৈক্য আবিষ্কৃত হইয়া যে সব ক্ষেত্রে দাম্পত্যজীবনকে প্রেমশূন্য ও দুর্ব্বহ কবিয়া ফেলে, তাহাব অতি সহজেই প্রতীকাব কবা যায়—যদি আমাদেব সমাজ পুরুষ ও নাবীব স্বাধীন রুচি ও আকাঙ্ক্ষাব উপবে বিবাহেব ভিত্তি স্থাপন কবে। কুমাব কুমাবী কালে যাহাবা পবস্পবকে জানিয়া চিনিয়া ভালোবাসিল, বব ও বধূরূপে বিবাহিত জীবনে তাহাদেব অমিল হইবার আশঙ্কা ততটা নাই।

কিন্তু কুমাব কুমাবীকে একত্র মিলিবাব সুযোগ দিযা স্বাধীন নির্ব্বাচনেব যে কথা তুলিলাম, তাহা বাঞ্ছনীয় হইলেও ইহাতে আমাদের সমাজেব আবও কতগুলি প্রথাকে সমূলে নাড়া দিতে হইবে। অববোধ প্রথা যথার্থভাবে উঠিয়া গিয়া নর ও নাবী যখন অবাধে সমান ক্ষেত্রে গিয়া মিলিবে, তখন কাহাব হৃদয় কাহার দিকে যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে, তাহাব কোনও বাঁধাধবা নিযম থাকিতে পাবে না। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে জাতিভেদেব ভিত্তি যখন গুণগত বা কর্ম্মগত কিছুই নাই, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যার প্রতি, বৈশ্যবালা শূদ্রযুবকের প্রতি,

অথবা ক্ষত্রিয় শূদ্রানীর প্রতি অনুরক্ত না হইবে অথবা হওয়া অন্যায়, এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। শুধু হিন্দুজাতির বিভিন্ন স্তর কেন, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি যে কোনও জাতিরই অপর জাতিতে আকৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। অথচ গৌরবিল, প্যাটেলবিল সত্ত্বেও আমাদের সমাজের জনমত অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে এখনও খড়্গহস্ত হইয়া রহিয়াছে, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের সম্বন্ধে তো কথাই নাই। কিন্তু বিবাহিত দম্পতীকে অবিচারের হাত হইতে মুক্তি দিতে চাহিলে তাহাদের স্বাধীন মনোনয়নের পথ প্রশস্ত রাখিতে হইবে, একথা একান্তই সত্য, এবং স্বাধীন মিলনের পথ বাধাশূন্য করিতে হইলে এই অর্থহীন জাতিভেদের ব্যবধান না ঘুচাইয়াও উপায় নাই।

বিবাহ যদি স্বাধীন রুচি ও আকাঙ্ক্ষার উপরে নির্ভর করে, তবে তারপরে সে বিবাহবন্ধন অবিচ্ছেদ্য হইতে পারে, ক্ষতি নাই। নির্ব্বাচনকালে ভুল তাহাদেরও হইতে পারে বটে, কিন্তু সে দায়িত্ব সমাজের নয়। তাহাতে যদি জীবন দুঃখময় হইয়া উঠে, তবে সে ভুলের আঘাত তাহাদের সহিতে হইবে বৈ কি। ভুল মানুষের মাঝে মাঝে হয় বটে, কিন্তু হয় বলিয়াই তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বরঞ্চ বিবাহের পূর্ব্বে নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া বিবাহের পরক্ষণে সে মিলনকে সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দিবার ব্যবস্থা করাই অনেক দিক দিয়া কাম্য, ইহাতে ভুল না করিবার দিকে দৃষ্টি পড়িবে আন্তরিক। মুহূর্ত্তের উদ্দামতাকে ভালোবাসা বলিয়া চালাইয়া দিয়া অবিলম্বে ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত মনের মানুষের সন্ধান লাভ করিবার ধীরতা ও সংযম মানুষকে বাধ্য

হইয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। এই ধৈর্য্য ও সংযম জীবনে অনেক মূল্য ধরে। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহকে অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই যদি জানা থাকে তবে জীবনখানিকে চিরমধুর রাখিবার আগ্রহে দম্পতী সেই প্রেমকে স্থায়িত্ব দিবার সাধনা করিবে—যে প্রেম তাহারা প্রথমদিনে স্বেচ্ছায় পরস্পরকে অর্পণ করিয়াছে। সম্ভোগস্পৃহা আপনার উত্তেজনায় আপনি আসে, কিন্তু প্রেম সাধনার সামগ্রী। অবিচ্ছেদ্যতার পরিবর্তে যদি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত free love এর অধিকার থাকে, তবে এই সাধনার পথে নরনারীর মন যাইবে না, কারণ যাইবার দরকারই নাই। কাজেই প্রেম সেখানে ফুটিবে না, মোহই আসিবে ক্ষণে ক্ষণে।

কিন্তু যদি এমন হয়, যে-মানুষটিকে সত্য সত্যই দেখিয়া শুনিয়া ভালোবাসিয়াছিলাম, সে বিবাহের পরে দৈববশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, হইল হয়তো উৎকটরোগগ্রস্ত, অথবা ব্যভিচারী অথবা অত্যাচারী, তখন উপায়? একের দোষে অন্যকে আজীবন পঙ্গু হইয়া থাকিতে বাধ্য করা বিবেকবুদ্ধিতে বড়ই বাজে। এই ক্ষেত্রে প্রতীকার করিতে গেলে divorce বা separation ছাড়া উপায় নাই—যেমন অন্যান্য অনেক দেশেই আছে।

কিন্তু ডাইভোর্স পর্য্যন্ত যাহারা আসিয়াছে, তাহাদেরও অস্বস্তি ঘুচে নাই। বিচ্ছেদপ্রথা যেদেশে যখন একেবারে বন্ধ ছিল, তখন মানুষ অনুভব করিয়াছিল পারিবারিক জীবনে অনেক অশান্তি ও অন্তর্দ্দাহ, হয়তো একের পাপে ও অত্যাচারে অন্যের নিরপরাধ জীবনের সকল আনন্দের ধ্বংস, আবার বিচ্ছেদকে আইনসঙ্গত স্বীকার করিয়া এখন হইতেছে অনেক ক্ষেত্রেই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়

এবং হয়তো একের পাপকে চাপা দিবার ও প্রবৃত্তিকে মুক্তি দিবার লোভে অন্যপক্ষের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ ও কলঙ্ক আরোপ। কেমন করিয়া বুঝা যাইবে, কোন্ divorce suitএর পিছনে যথার্থ বেদনা কাঁদিতেছে, কোনটি শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার মুখোস মাত্র? বিবাহকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া না দিয়া মাঝামাঝি পথ আর একটি আছে—judicial separation. এরূপ ব্যবস্থায় স্বামী স্বামীই রহিল, স্ত্রী স্ত্রীই, শুধু আইনের আদেশে তাহারা পরস্পর পৃথক্ হইয়া রহিল মাত্র। আশা—ইহাতে হয়তো বা ভবিষ্যতে কখনও অসামঞ্জস্যের কারণটি মিটিয়া গিয়া স্বামী-স্ত্রী আবার যথার্থভাবে মিলিত হইতে পারে, এবং যদি নিতান্ত মিলিত না-ই হয়, তথাপি তাহাদের পরস্পর দূরত্বের কল্যাণে বিরোধের হেতুটি কোনই বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না। কিন্তু আশানুযায়ী ফল ইহাতেও মেলে নাই। এই বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার পরে আবার যে পতিপত্নীর মিলন ঘটিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বড় বেশী দেখা যায় না। অনেক স্থলে লাভের মধ্যে হয় এই, ব্যবধানের দরুণ স্বামী ও স্ত্রীকে বাধ্য হইয়া কামনার চরিতার্থতা হইতে বিরত থাকিতে হয়, অথচ দেহের আকাঙ্ক্ষাকে সহজে জয় করিতেও পারে না, সুতরাং তাহারা চরিতার্থতা খোঁজে সমাজের চক্ষে ধূলা দিয়া অপরের সহিত অবৈধ সংযোগে। সমাজের পবিত্রতা আড়ালে পঙ্কিল হইয়া উঠে। এই কারণেই যেসব দেশে divorce সমর্থিত হয়, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে judicial separation সমর্থন করে না।

এখন উপায় কি? একদিকে সমাজের স্থিতি ও সুব্যবস্থা, আর একদিকে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি সুবিচার, একদিকে নীতি ও

ধর্ম্ম, অন্যদিকে মানব মনেব স্বাভাবিক প্রেম ও মিলনাকাঙ্ক্ষা। দুইটি বজায় থাকে কোন্ ব্যবস্থায় ?

নবীন বাশিয়া ভোগকে ত্যাগেব চেয়ে এবং দেহকে আত্মাব চেয়ে বড স্থান দিযাছে, আত্মা তাহাবা স্বীকাব কবে না। স্থতবাং মানব দেহেব স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাব সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মেব সামঞ্জস্য করিবার প্রশ্নই তাহাদেব নাই। আমবা যাহাকে অপবিত্রতা ও অধর্ম্ম বলি, তাহাব অনেক প্রথাই তাহাদেব চক্ষে নির্ম্মল ও প্রশংসনীয়। দ্বিতীযতঃ, তাহাদের সমাজব্যবস্থা এক অভিনব পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত বলিয়া ব্যক্তিগত জীবনেব ভোগাকাঙ্ক্ষাব সহিত সমাজের কোনও সংঘর্ষ ঘটে না। ব্যক্তিত্বকে ইহাবা খাটো কবিয়াছে শুধু রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজেব কাছে, কিন্তু পবিবাবেব কাছে নয়। ব্যক্তিব সমষ্টিতে ইহাদেব সমাজ গডিযা উঠিযাছে, পবিবাবেব সমষ্টিতে নয়। বাকী পৃথিবীব সহিত এইখানে বাশিযাব একটি মূলগত তফাৎ। তাহাদের বিবাহ-ব্যবস্থাও তাই একেবাবে নূতন বকমেব। আমাদেব বিবাহিত জীবনেব প্রেমকে আমবা স্ত্রীব প্রতি দায়িত্বে, স্বামীব প্রতি দায়িত্বে ও পুত্রকন্যাব প্রতি দায়িত্বে গভীব ও সংযমাত্মক কবিয়া তুলিতে চাই। কাবণ, তাহা না হইলে পবিবাবেব বন্ধন দৃঢ হয় না। বাশিযাতে বিবাহ কেবলমাত্র স্বামী ও স্ত্রীব প্রেমসম্ভোগের জন্য, পুত্রকন্যাব প্রতি দায়িত্বও তাহাদেব নাই। সে দায়িত্ব বহন কবে তাহাদেব বাষ্ট্রগত সমাজ। সন্তানেব জন্ম দিয়াই পিতামাতা নিশ্চিন্ত, তাহাব শিক্ষাদীক্ষা পরিপালনেব ভাব সমাজেব উপব, কারণ, এই শিশু ভবিষ্যৎ নাগরিক, স্থতবাং সমাজের সম্পত্তি। অতএব পবিবারের

বালাই সেখানে উঠিয়া গিয়াছে। এমন কি, যে স্বামী-স্ত্রী লইয়া ঘর, তাহাদের পরস্পরের প্রেমকেও স্থায়িত্ব দিবার জন্য তাহারা ব্যস্ত নয়। যতদিন সৌভাগ্যক্রমে বজায় থাকে থাকুক্, না থাকিলেও দুর্ভাগ্য মনে করিবার কিছু কারণ নাই। প্রেমের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিলে অমনি বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। রাষ্ট্র বা সমাজ বাধা দিবে না। বিবাহবিচ্ছেদে নর ও নারী দুইএরই এখানে সম্পূর্ণ সমান অধিকার। দুইটি পুরুষ ও নারীর মনে যেমনই পরস্পর বিবাহিত হইবার সাধ হইল, তাহারা উভয়ে একত্র হইয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে সংকল্প জানাইয়া আবেদন করিলেই আইনানুসারে হইয়া গেল তাহাদের বিবাহ। আবার যে কোনও কারণে যদি একের মত পরিবর্ত্তিত হয়, তবে পুনরায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সঙ্গত্যাগ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেই তিনি বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন, অপর পক্ষের সম্মতি অথবা কোনও কারণ প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই। অন্যান্য সকল দেশে প্রত্যেকটি ডাইভোর্সের পিছনে যে গুরুতর অভিযোগ বর্ত্তমান থাকে, এখানে তাহার কোনও প্রশ্নই উঠে না। ডাইভোর্স এখানে কাহারও ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয়, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা। আরও একটি সুবিধা এই যে, অন্যান্য দেশে ডাইভোর্স অনুমোদন করিবার অধিকার সমস্ত আদালতের নাই, মাত্র দুইচারিটি বিশেষ বিশেষ বিচারালয়েরই আছে। কিন্তু রাশিয়াতে যে কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দিবার অধিকারী। সেইজন্য অন্যত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি আদায় করা দরিদ্রের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, রাশিয়াতে তাহা সর্ব্বসাধারণেরই সুলভ।

রাশিয়ার এই বিবাহপদ্ধতি মানুষের যৌনজীবনকে একেবারে বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সমগ্রজীবনের সর্ব্বোত্তম বিকাশের পথে অনুকূল কি প্রতিকূল, এবং আমাদের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে কিনা, সে বিষয়ে অনেক তর্ক উঠিতে পারে। প্রথম কথা, সমাজ যতদিন পরিবারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন ইচ্ছামাত্রেই অবলীলাক্রমে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে দেওয়া চলে না, কারণ ইহাতে পরিবার ক্ষণভঙ্গুর হইয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা আসে। রাশিয়াতে সমাজের ভিত্তি পরিবার নয়, কাজেই সে ব্যবস্থা খাটে। রাশিয়াতে সন্তান পরিপালনের দায়িত্ব নাই সুতরাং পিতামাতার সম্বন্ধ টুটিলে ঝঞ্ঝাটও নাই। কিন্তু আমাদের দেশে ঐ প্রথার প্রবর্ত্তন হইলে প্রত্যেক বিবাহের সন্তানসন্ততিগুলির প্রতি দায়িত্বরক্ষা ও পরিবারে তাহাদের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করা একান্ত জটিল হইয়া পড়ে। অসম্ভব বলিলেও চলে। তবে পরিবার প্রথা যদি তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথক্ কথা।

ধরিলাম, তাহাই হইল, সামাজিক সুশৃঙ্খলার দিক হইতে যেন কোনও বাধা নাই। কিন্তু তথাপি ইহা মানুষের কল্যাণ ও আনন্দের পক্ষে অনুকূল হইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ যথেষ্ট। মানুষ বিবাহ করে শুধু দেহের সম্ভোগের জন্য নয়, মনের সম্ভোগের জন্যও। পশুদের মনের বালাই নাই, কিন্তু আমাদের আছে। আমরা নরনারী দেহকে আশ্র করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইতে কেমন করিয়া যেন মনের কোঠায় উঠিয়া পড়ি এবং ভালোবাসিয়া ফেলি। দেহের লালসা মনের রঙে প্রেম হইয়া ফুটিয়া উঠে সুক্ষ্মতররূপে। এই

প্রেম মানসিক পরিকর্ষের তারতম্যভেদে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম হইয়া বিভিন্ন মানুষের জীবনে অনেক সময় এমন বিরাট্ হইয়া উঠে, যখন সে দেহের মোহ একেবারেই পাসরিয়া যায়, থাকে শুধু মর্ম্মমাঝে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য। এই ভালোবাসা মানবজীবনের একটি সুন্দরতম সম্পদ। রাশিয়াতে যে Companionate marriage প্রচলিত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনেকে আজকাল তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে অনেকখানি। কিন্তু এই Companionate marriage অথবা free love, যাহাই বলি না কেন, মানব মনের প্রেমের সৌন্দর্য্যকে আড়াল করিয়া দেয়, একথা উপেক্ষা করা চলে না। এবং এ ক্ষতি আমাদের একটি বড় ক্ষতি। যাহারা বলে, চঞ্চলতায় ও ক্ষণে ক্ষণে আধার পরিবর্ত্তনে প্রেমের মূল্য হ্রাস হয় না, যাহারা বলে, সম্ভোগের মধ্যেই প্রেমের মধুরতম ও শ্রেষ্ঠতম স্ফূর্ত্তি, তাহাদের নিছক গায়ের জোরের কথা। মানুষের মনের যে কোনও উচ্চ ও সূক্ষ্ম প্রেরণাই যেমন প্রয়াস ও সাধনা-সাপেক্ষ, প্রেমও তেমনই একটি। দেহের খেয়ালের অনুবর্ত্তিতায় দেহ হয়তো পুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনকে পাওয়া যায় না। এবং প্রেম মনেরই জিনিষ। যুদ্ধক্ষেত্রে মরিতে বসিয়া তৃষ্ণার্ত্ত স্যার ফিলিপ্ সিড্নী যখন মুখের জলপাত্র নামাইয়া পাশের সৈনিকটিকে বলিলেন, Thy necessity is greater than mine, তখন দেহটা তাঁহাকে মনে মনে অভিসম্পাত দিল হয়তো, কিন্তু মনের পুষ্টি জীবনখানিকে তৃপ্ত ও পরিপূর্ণ করিল।

মানুষের দেহ-মনের মিলন ও কলহ এমনই রহস্যে ভরা যে,

দেহকে একেবারে পিষিয়া মারিতে গেলে মনও সঙ্গে সঙ্গে কাবু হইয়া পড়ে, অথচ মনকে সুন্দর ও মহৎ করিতে হইলে দেহকে তাহার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত কবিতেও হয়। দেহেব এই নিয়ন্ত্রণেব সুযোগ free loveএব ব্যবস্থায় নাই, আছে একনিষ্ঠ বিবাহিত জীবনে। উহাতে আছে শুধু দৈহিক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা, কিন্তু প্রেমের তৃপ্তি নাই। চঞ্চল মিলনেব ক্ষণগুলিকে যতই তাহাবা প্রেমেব চবমতম পবিপূর্ণতা বলিযা গৌবব করুক, আমরা অস্বীকাব করি। আমবা জানি, তাহা প্রেমই নয়, তবে প্রেমেব গোড়াব বীজটি বটে। এবং বীজে ও ফুলে পার্থক্য যথেষ্ট, সৌন্দর্য্য বীজে নাই, ফুলে আছে। সেই মিলনে সুবাি মাদকতা ও তীব্রতা আছে, সুধার মধুরতা নাই। ইহা মুহূর্ত্তেকেব উত্তেজনায় স্বার্থবশে দুইজনকে কাছাকাছি টানিয়া আনে মাত্র, চিবজীবনেব মত পবস্পরকে স্নিগ্ধচ্ছায়া দান করিবাব শক্তি বা প্রেরণা নাই। অথচ আমরা চাই সেইটুকু। সমাজ-সৃষ্টিব জন্য শুধু ঐ গোড়াব মিলনই যথেষ্ট, কিন্তু সমাজের স্থিতি ও কল্যাণেব জন্য উচ্চতব প্রেম চাই। এইখানে আবও একটি গভীর সত্য যেন ভুলিয়া না যাই যে, নবনারীব সম্ভোগ-প্রবৃত্তি যদি নির্ব্বাধে ছুটিয়া চলিবাব অবকাশ পায়, তবে তাহা অবশেষে শুধু ঐ একটি মাত্র প্রবৃত্তিবই নয়, মানুষেব সমস্ত প্রবৃত্তিবই লাগাম আল্‌গা কবিয়া ফেলে, এবং মানুষ তখন আপনাব উপর প্রভুত্ব হাবাইয়া হইয়া পড়ে দুর্ব্বল। সংযম এমন একটি শক্তি, যাহাব আছে সে সকল ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারে, যাহাব নাই, সে কোনও ক্ষেত্রেই পাবে না। সমাজকে সুন্দরতর করিয়া

তুলিতে হইলে যথেচ্ছ সম্ভোগের পথে লোভ না দেখাইয়া এই সংযমেব অর্থাৎ উর্দ্ধমুখী প্রেমেব পথ সুগম কবিয়া দিতে হইবে। বাশিয়াব বিবাহপ্রথা তাহা কবে নাই।

বিবাহব্যাপাবে সমস্যা আবও একটি আছে। প্রাচীনকালে পৃথিবীব সর্ব্বত্রই বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, এখন সভ্যদেশে আব নাই। আমরা সভ্য হইলেও পুরুষেব পক্ষে বহুবিবাহ এখনও সমর্থন কবিয়া থাকি,—কার্য্যতঃ না হইলেও আইনতঃ। আমাদেব আধুনিক শিক্ষিত পুরুষগণ চক্ষুলজ্জার খাতিবে আজকাল একাধিক বিবাহ প্রায় ছাডিয়া দিয়াছেন বলিলেই চলে, কিন্তু যদি কেহ কবেন তবে আইনেব বিচাবে তাঁহাব সন্তান অবৈধ বলিয়া গণ্য হয না। নাবীব পক্ষে বহুবিবাহ অবৈধ, ডাইভোর্স অবৈধ, বিধবাব পুনর্ব্বিবাহ কিছুকাল যাবৎ আইনানুমোদিত হইযাছে। বহুবিবাহনিবোধ সম্বন্ধে আপত্তি কাহাবোই নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, দেশেব জনসংখ্যায় স্ত্রী ও পুরুষেব সংখ্যা সকল সময় সমান থাকে না। কখনও পুরুষেব সংখ্যা নাবীব চেয়ে বেশী, কখনও নাবী পুরুষেব চেয়ে অধিক। গত ১৯৩১ সনের আদমসুমারীতে দেখা গিয়াছে, বাংলাদেশে পুরুষেব সংখ্যা দুইকোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ, নারী দুই কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষেব কিছু কম। নরনাবী উভয়পক্ষেব বিবাহ যদি একনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে এই যে বিশলক্ষ পুরুষ ইহাবা কবিবে কি? নাবীব বহুবিবাহ অথবা free love প্রবর্ত্তন কবিলে সমস্যা অতি সহজে মিটিয়া যায়। কিন্তু তাহা করিতে কি আমরা বাজি হইব? অথচ যদি না কবি, তবে এই বিপুল পুরুষসমাজেব বাধ্য হইয়া বিবাহিত জীবন হইতে বঞ্চিত থাকা ছাড়া উপায়

নাই। ফলে, সংযমের শক্তি জাতির প্রাণে যদি ব্যাপকভাবে বল-সঞ্চার করিয়া থাকে, তবে ইহারা কল্যাণের জন্য বাসনার বলি দিবে, যদি না করিয়া থাকে, ভোগবাদই যদি জাতির মন্ত্র হয়, তবে ইহারা অবৈধ-ভাবে আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ না করিয়া পারিবে না। দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি চাই এবং কেমন করিয়া চাই ?

সমস্যা সকল দিক্‌ দিয়াই জটিল ও বহুমুখী। অথচ সমাধান না করিতে পারিলে শান্তি নাই। দেহ ক্ষুধায় গর্জ্জন করে, আত্মা বিপরীত দিকে ধায় অসীমের টানে, মাঝখানে অপূর্ণ মানব মানবীর প্রেমাকুল হিয়া বেদনায় কাঁদে।

শাঁখা-সিঁদুর-ঘোমটা

বধূ যখন মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া সীমন্তে ও ললাটে সিঁদুর আঁকিয়া সলজ্জবেশে দাঁড়ায়, দেখিতে বেশ লাগে। হাতের শঙ্খচিহ্ন সহসা চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু বধূ জানে, ওটি তাহার না হইলেই নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনটি সজ্জাভরণে মিলিয়া তাহার দেহে ও মনে যেন একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাখাইয়া দেয়, যাহাকে সে নিজেও মনে করে অনির্ব্বচনীয়, অপরেও বলে তাই। বোধ হয় এইজন্যই আধুনিকাগণ পুরাতন সামাজিক রীতিনীতি অনেক পরিমাণে সংস্কার করিয়া চলিলেও ও তিনটিকে এখনও পরিহার করিতে পারেন নাই। অবগুণ্ঠন আজ-কাল কমিয়া আসিয়াছে, পর্দ্দাপ্রথার উচ্ছেদের সাথে সাথে উহারও দৈর্ঘ্য কমিতে কমিতে খোঁপার উপরিভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে, তথাপি একেবারে স্খলিত হইতে সাহসী হয় নাই। শাঁখাও অন্যান্য আভরণের সঙ্গে অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, তবে অনেকে উহাকে আগের মত আর অপরিহার্য্য মনে করেন না। কিন্তু সর্ব্বজয়ী হইয়া বিরাজ করে সিঁদুর, উহার মায়া কাটাইবার মত যথেষ্ট উৎসাহ কাহারও মধ্যে দেখিতে পাইনা। এমন কি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বতন্ত্রসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মিকাগণও হিন্দুর সিন্দুরবিন্দু সগৌরবে সীমন্তে ধারণ করিয়া থাকেন, এবং ততোধিক আশ্চর্য্য, বাঙ্গালী খৃষ্টান মহিলাগণকেও, এবং

দুই একটি মুসলমান মহিলাকেও, কোনও কোনও স্থলে সিঁদুর পরিতে দেখিয়াছি।

স্বভাবের একটি দোষ আছে, কোনও বিষয়কেই ভাসা-ভাসা বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না, একেবারে মূল পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে কৌতূহল জাগে। তাই শাঁখা-সিঁদুর-প্রথাগুলিকে লইয়াও অনেক সময় অনেক কথা ভাবি, হয়তো বা সেগুলি অবান্তর। কিন্তু বাস্তবিক কেহ বলিতে পারেন কি, বিবাহিতজীবনে শাঁখা-সিঁদুর-ঘোমটার সম্বন্ধে মেয়েদের এই মায়া ও সমাজের এই অনুশাসন কেন? স্বীকার করি, এগুলি দেখিতে সুন্দর লাগে এবং সেইজন্যই বোধহয় ব্রাহ্ম খৃষ্টানগণও সামাজিক নির্দ্দেশ না থাকা সত্বেও এগুলি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন। কিন্তু এই যে সৌন্দর্য্য, এ সৌন্দর্য্য কি চোখের, না মনের? একজন অনবগুণ্ঠিতা শুভ্রভাল সুন্দরী কুমারীকে দেখিতে যতখানি ভালো লাগে, সহসা সীমন্তে রক্তরেখা ও মস্তকে অবগুণ্ঠন ধারণ করিলেই তাহার রূপ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে কেন, বুঝিতে পারি না। যদিই বা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লই, তবে সে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি কুমারীকালে করিলেই বা দোষ কি? কারণ, কুমারীকালে কপালে লাল টিপ্ পরিবার রীতি আছে, এবং ব্রাহ্মিকা, খৃষ্টান ও মুসলমান মহিলাগণ কুমারীকালেও বয়স্থা হইলেই মাথায় অবগুণ্ঠন রক্ষা করেন। সুতরাং বিবাহ হওয়ামাত্রই এগুলি এক অভিনব রূপ ধারণ করে, অন্যথা করে না, ইহার কোনও অর্থ হয় না। বধূবেশে এগুলিকে আমরা যে অনির্ব্বচনীয় শ্রী বলিয়া মনে করি, ইহা আমাদের মনের সংস্কার। জন্ম হইতে চারিদিকে এ ব্যবস্থা দেখিতে দেখিতে এবং পুঁথিপুরাণে কাব্য-

গ্রন্থে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে আমরা এই চিত্রে এতই অভ্যস্ত হইয়া আছি যে, ইহার বিপরীত কল্পনা করিতে অসুন্দর মনে হয়। পতির প্রতি নারীহৃদয়ের সমস্ত প্রেমকে, নারীর সমস্ত কল্যাণমূর্ত্তিকে, আমরা এই নিদর্শনগুলির মধ্যে যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছি। তাই এগুলি না হইলে হিন্দুনারীর চলে না। মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন, শিক্ষিতাদেরও মনের মধ্যে আজন্মপুষ্ট এই সংস্কার এমন ভাবে বাসা বাঁধিয়া আছে যে, এগুলির, বিশেষতঃ সিঁদূরের অদর্শন ঘটিলে মনের কোণে অলক্ষিতে সাড়া পড়ে। এ সংস্কার যদি তাঁহাদের না থাকিত, তাহা হইলে বহুপূর্ব্বেই অন্যান্য আবর্জ্জনার মত এ প্রথাও দূরীকৃত হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই।

আমি শাঁখা-সিঁদূর-ঘোমটা বর্জ্জন করিবার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কিছুই বলিতে চাহি না। কারণ এগুলি শুধুই বাহিরের সৌষ্ঠব, মেয়েদের আর পাঁচটা সাজসজ্জার সঙ্গে আরও গুটিকয়েক মাত্র, সুতরাং থাকিলেও ক্ষতি নাই, না থাকিলেও না। কিন্তু ভাবিবার কথা এই যে, স্বামিলাভের নিদর্শনস্বরূপ কতগুলি চিহ্ন সতত অঙ্গে ধারণ করা নারীজীবনের জন্য বিহিত হইল কেন? এই ব্যবস্থা শুধু যে আমাদের সমাজেই, তাহা নয়, পৃথিবীর বহু সভ্য ও অসভ্য সমাজেও বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান ছিল এবং আছে জানি। তবে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে সর্ব্ববিষয়েই কৃত্রিম পার্থক্য টানা ও বৈষম্যের ব্যবস্থা করার যে অতিরিক্ত প্রবণতা, তদনুসারে এ বিষয়েও তাহাদেরই বাড়াবাড়ি একটু বেশী।—অবিবাহিত জীবনের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে, এবং সেই পার্থক্য সূচিত করিবার জন্য

আচারে ব্যবহারে, অথবা বাহ্যিক বেশভূষায় যদি কোনও বিশিষ্টতা আরোপ করা হয়, তাহাতে কোনই আপত্তির কারণ নাই; বরং কোনও কোনও দিক্ দিয়া দম্পতীর পক্ষে এরূপ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়ও বটে। দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করিবার অভিলাষ লইয়া দুইটি নবনারী যেমন বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সমাজের সম্মতি গ্রহণ করিয়া লয়, তেমনই সেই জীবন যতকাল স্থায়ী হয়, ততকাল তাহার স্থায়িত্ব সমাজের কাছে ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে কোনরূপ বিশেষ আচরণপদ্ধতি বা বাহ্যিক বেশভূষা মানিয়া লওয়া মন্দ নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এই যে, এ বিষয়ে একতরফা বিচার কেন? নারীর পক্ষে স্বামিপ্রাপ্তি ঘোষণার জন্য এত জাঁকজমক্, অথচ পুরুষের পক্ষে বিবাহস্বীকার করিবার মত বহিরাচরণের কোনই বালাই নাই, এ কেমন কথা? পত্নী যেমন সিঁদুর পরেন, পতিও তেমনই সর্ব্বদা তিলক ধারণ করিতে পারেন, পত্নীর পক্ষে অবগুণ্ঠন যেমন বাধ্যতা-মূলক, বিবাহিত পুরুষের পক্ষে তেমনি হয়তো চাদর ব্যবহার বাধ্যতা-মূলক হইতে পারিত (অবগুণ্ঠনের প্রস্তাব না হয় নাই করিলাম), কুমারী মেয়ে যেমন শাঁখা বা লোহা (দেশবিভেদে) পরেন না এবং বিবাহিত হইলে অবশ্যই পরেন, পুরুষের পক্ষেও তেমনই বিধান হইতে পারিত—অবিবাহিতেরা অঙ্গুরী পরিবেন না, বিবাহিতেরা অপরিহার্য্য-রূপে পরিবেন, অথবা এমনই যা হউক একটা কিছু। অর্থাৎ সমাজ-ব্যবস্থাপকদিগের ইচ্ছা থাকিলে এরূপ যে কোনও কিছু বিবাহপরিচায়ক নিদর্শন পুরুষের পক্ষে বিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই। শাঁখা-সিঁদুরাদির ব্যবস্থা যদি পত্নীর স্বামিপ্রেমের প্রতীকরূপে

করা হইয়া থাকে, তবে স্বামীর পত্নীপ্রেমের প্রতীকরূপে একটা কিছু নিদর্শন ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকাও সমানই উচিত ছিল। অন্যথা বুঝিতে হইবে, পতিপ্রেমকে নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া সাব্যস্ত করা হইলেও পতির পক্ষে পত্নীকে ভালোবাসার কোনও প্রয়োজন বা দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করা হয় নাই। মেয়েদের পক্ষে শাঁখা-সিঁদূরের ঘটা ও পুরুষের বেলায় সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অব্যাহতি ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। দেখিয়া শুনিয়া একমাত্র সিদ্ধান্ত এই হয় যে, মেয়েদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিবাহগত করিয়া রাখাই আমাদের সমাজকর্ত্তৃগণের উদ্দেশ্য ছিল, এবং পক্ষান্তরে, বিবাহের সুখ সমানই ভাবে উপভোগ করা সত্ত্বেও পুরুষেরা বিবাহকে নিজেদের জীবনের একমাত্র কেন, মুখ্য ব্যাপার বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের গতিবিধির ব্যবস্থা যথাসম্ভব মানুষ হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু নারীর জীবনকে মনুষ্যত্বের অখণ্ড কল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিবাহিত জীবনেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত করিয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা অবাস্তর হইবে না যে, আমাদের সমাজে নারীর শুধু নারীরূপে কোনও স্থান নাই, সে হয় কুমারী, নয় সধবা, নয় বিধবা, অর্থাৎ বিবাহহিসাবেই তাহার জীবনের বিভাগ ও ব্যবস্থা নির্দ্দেশ)। এই জন্যই শাঁখা, সিঁদূর, অবগুণ্ঠন ইত্যাদি অশেষ প্রকারের নিদর্শন দ্বারা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে বিবাহিত জীবন স্মরণ করাইয়া দিবার সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। পতির জীবনের অনুসারেই তাহার সমগ্র জীবন—এই ভাবটি নারীর মনের উপরে দুরপনেয়ভাবে বিস্তার করিতে ইহা

বাস্তবিকই একটি অপরূপ মায়াজাল, স্বীকার না করিয়া সাধ্য নাই। কুমারী দেখে, পতিকে বরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনের আচার-ব্যবহার এমন কি বাহিরের রূপ পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া যায়, আবার অপর দিকে মর্ম্মাহত নেত্রে বিধবাও দেখে তাহাই। একই নারী—কুমারীকালে, পতিলাভ করিবার পরে, ও পতিকে হারাইবার পরে—ত্রিবিধ অবস্থায়, অশনে বসনে ভূষণে আচারে বিচারে তিনটি বিভিন্ন মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। পতিদেবতার কি আশ্চর্য্য মহিমা। অথচ একটি পুরুষকে বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কোনকালে কোনদিক দিয়াই ধরিবার সাধ্য নাই, সে বিবাহিত কি অবিবাহিত, সপত্নীক কি বিপত্নীক। অর্থাৎ বিবাহিত জীবন লইয়া সে মাথা ঘামায় না। নারীমনকে স্বতন্ত্র মনুষ্যত্ব বিস্মরণ করাইয়া পতিসর্ব্বস্ব করিয়া রাখিবার জন্যই প্রধানতঃ শাঁখা-সিঁদূরাদি প্রথার প্রবল প্রভাবের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল।

কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণ মূলে আছে। বিবাহ-মাত্রই হিন্দুনারী স্বামীর সম্পত্তি হইয়া পড়িল ('স্বামী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিবেন), বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণে রহিলেও তাঁহাদের ঠিক সম্পত্তি নয়, অর্থাৎ অবিবাহিত কালে অপর যে কোনও পুরুষ তাহার প্রতি লোভ করিতে অধিকারী, এমন কি, নিতান্ত লোভ সংবরণ করিতে না পারিলে অভিভাবকের সম্মতির বিরুদ্ধে তাহাকে চুরি করিয়া আত্মসাৎ করিলেও হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ হয় না। কিন্তু বিবাহ হইলেই সে গুড়ে বালি পড়ে, আর তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার

অধিকার নাই, কারণ সে এখন অপরেব সম্পত্তি। কুমারী বালিকা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের কড়াকড়ি না থাকিলেও পবস্ত্রীসম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি (নহিলে পুরুষেবই বিপদ ঘটে।), কাজেই কে কুমাবী এবং কে সধবা, ইহার অতি পবিস্ফুট পবিচয় নাবীব সর্ব্বাঙ্গে না থাকিলে পুরুষেব পক্ষে অসুবিধায় পডিবাব সম্ভাবনা—অর্থাৎ লোলুপ হইবাব অধিকাব আছে কিনা, তাহা সে বুঝিযা উঠিতে পাবে না। সুতবাং শাঁখা-সিঁদূব প্রভৃতি ট্রেড্মার্কেব প্রয়ো-জন একান্তই হইল। পুরুষেব পক্ষে এরূপ ট্রেড্মার্কেব প্রযোজন ছিল না, কাবণ বিবাহিত পুরুষ পত্নীর সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কোনও কুমাবী কন্যা কোনও পুরুষেব প্রতি আকৃষ্ট হইলে জানিবাব দবকাবই নাই, সে পুরুষ বিবাহিত কি অবিবাহিত, যেহেতু হিন্দুসমাজে পুরুষেব বহুবিবাহেব অবাধ অধিকাব আছে, সুতবাং মাল্যদান কবিলেই হইল। আব, বিবাহিতা নাবীব পক্ষে তো অপব কোনও পুরুষেব প্রতি আকৃষ্ট হওযাব প্রশ্নই উঠিতে পাবে না, কেন না, সে পবপুরুষেব পানে চাহিবাবই অধিকাবী নয়, আকর্ষণ বিকর্ষণ তো দূবেব কথা।

অবগুণ্ঠন সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আব একটু কথা বলি। অবগুণ্ঠন হিন্দুসমাজে বিবাহিতাবাই ধাবণ করেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম খৃষ্টান ও মুসলমানগণ অবিবাহিতা অবস্থাতেই একটু বয়স্থা হইলে ধাবণ কবেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাতে বুঝা যায়, ইহা পত্নীত্বেব বিজ্ঞাপন ততটা নয়, যতটা যৌবনের বিজ্ঞাপন এবং পুরুষেব দৃষ্টি হইতে নিজের বদনকমল অন্তবাল করার প্রচেষ্টা। সকলেই জানি,

পর্দ্দাপ্রথাব মূলে এই কাবণই বর্ত্তমান। কিন্তু আজকাল সে অন্তবালকাবী অবগুণ্ঠন মেয়েদেব মুখে বড একটা দৃষ্ট হয়না (যে সব মুসলমান নাবী 'বোবৃখা' পবিধান কবিয়া থাকেন তাঁহা-দেব কথা বাদ দিতেছি), এখন উহা শুধু একটু আনুষ্ঠানিক চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতবাং উহাতে এখন ভাবের তাৎপর্য্য ছাডা কাজেব তাৎপর্য্য কিছুই নাই । আর ভাবের দিক্ হইতে ভাবিতে গেলেও সম্মানজনক কিছু দেখিতে পাই না, পবন্তু পুরুষেব পক্ষে ইহাতে অসম্মানেব যথেষ্ট কাবণ আছে। কেন না, অবগুণ্ঠন প্রথাব মূলে পুরুষেব চক্ষু হইতে লুকাইবাব যে প্রয়াস নিহিত আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, যে সমাজেব পুরুষগণ যত বেশী অসংযত সেই সমাজেই পর্দ্দাপ্রথাব প্রয়োজন তত অধিক এবং ঘোম্‌টা প্রথাটি সেই বর্ব্ববোচিত সমাজেবই স্মৃতিখানি বজায বাখিবাব সহায়তা করিতেছে মাত্র।

সামান্য শাঁখা-সিঁদূব-ঘোমটা অবলম্বনে অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম। কিন্তু চিহ্নগুলি সামান্য হইলেও ইহাব পশ্চাতে এত গভীব কার্য্য-কাবণ-সূত্র বহিয়াছে এবং আমাদেব সমাজে এমন ব্যাপকভাবে অলক্ষ্য প্রভাব বিস্তাব কবিয়া আছে যে, প্রত্যেক শিক্ষিত নব-নাবীবই এ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা কবিয়া দেখা উচিত। যে সকল আচবণ আচবণহিসাবে নগণ্য, অথচ কার্য্য-কাবণ-নির্ণয়ে অসভ্য-সমাজোচিত এবং পক্ষপাতদুষ্ট, তাহাকে কেবলমাত্র পুবাতন বীতিব মোহবশে মানিযা লওয়াব সার্থকতা কতটুকু, তাহা ভাবিবার বিষয়।

বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার

কিছুকাল হইতে আমাদেব শিক্ষিত হিন্দুসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদেব গুঞ্জন বণিত হইতে শুনিতেছি। ব্যবস্থাপবিষদে এ বিষয়ে প্রস্তাব পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কিন্তু উঠিতে উঠিতে নামিয়া গেল, বিলটি পাশ হওয়া ঘটিল না এবং তর্কযুদ্ধে বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণেব মতামত শুনিবাব সৌভাগ্য হইতেও আপাততঃ বঞ্চিত হইযাছি। তবে কেন্দ্রীয় পবিষদ্ এবিষয়ে হিন্দু জনসাধারণেব যে মতামত আহ্বান কবিযাছিলেন, তাহাব উত্তবে কাহাবও কাহাবও আলোচনা সংবাদপত্রেব সাবফৎ চোখে পডিযাছে।

বিষয়টি আলোচনাব যোগ্য। কেন না, একথা সত্য যে, আমাদেব সমাজে বহু বিবাহিত জীবনে অশান্তিব কালছায়া স্ত্রীব জীবনকে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে আচ্ছন্ন কবিযা বহিযাছে এবং ইহার প্রতীকাব প্রয়োজন।

দাম্পত্য-জীবনেব যে অশান্তিব কথা বলিতেছি, তাহাব কাবণ খুঁজিতে গেলে প্রথমেই গোডাব দিকে দৃষ্টি পডিবাব কথা। প্রথমেই প্রশ্ন মনে আসিবে—কিসেব আশায় মানুষ বিবাহ কবে? এই আশা যখন অপূর্ণ হয়, তখনই দাম্পত্যজীবন বিষময় হইয়া উঠে, এবং এই বিষভাণ্ড বহন কবিবাব ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পডিয়া যায নাবীব স্কন্ধে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার

আমরা দেখি, মানুষ বিবাহ করে, প্রথমতঃ—দৈহিক কামনা চরিতার্থ করিবার আগ্রহে।

দ্বিতীয়তঃ—সংসারে স্বচ্ছন্দে ও আরামে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার আশায়, অর্থাৎ পুরুষ নারীর সেবা-যত্ন পাইবার আশায় ও নারী পুরুষের নিকট হইতে রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্রাসাচ্ছাদন লাভের জন্য।

তৃতীয়তঃ—প্রেমজীবনকে সমৃদ্ধ করিবার প্রেরণায়।

রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি ইহার বিভিন্ন কারণে মুখ্যতঃ বিবাহ করে। তবে আমাদের দেশে সমাজের অতি বিপুল অংশই প্রথম দুই কারণে বিবাহ করিয়া থাকে, তাহাতে প্রেমের স্থান অতি অল্পই। এমন কি, পশ্চিম জগতেও—যেখানে প্রেমমূলক বিবাহরীতি প্রচলিত আছে বলিয়া আমাদের ধারণা—তৃতীয়োক্ত কারণে বিবাহ করিবার মত লোক বেশী নাই। কেহ ইহাতে বিস্মিত হইবেন না। কারণ, যথার্থ প্রেমের দ্বারা জীবনকে ঐশ্বর্য্যশালী করিতে পারিয়াছে অথবা করিতে চায়, এমন লোক এখনও পৃথিবীতে মুষ্টিমেয়। প্রেম নামে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা ঐ প্রথমোক্ত ব্যাপারেরই সামান্য রূপান্তর মাত্র। তৃতীয়োক্ত কারণ দ্বারা আমি সেরূপ প্রেম বুঝাইতে চাহি নাই। কিন্তু বিদেশের কথা যাক্, দেশের কথাই ভাবি।

বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা তখনই উঠে, যখন যে কোনও ঘটনা-চক্রে হউক, বিবাহের ঐ তিনটি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বসে। যিনি প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্য লইয়া বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই

উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হইলেই বিবাহ্-বিচ্ছেদেব পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলিয়া তিনি মনে কবিতে পাবেন। এবং যদি আমবা স্বীকার কবিয়া লই যে, উপবোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যেব মধ্যে প্রত্যেকটিই সভ্যজগতে বিবাহেব পক্ষে সঙ্গত বলিয়া ধবা যায়, কোনটিই অন্যায অথবা অবৈধ নয়, তাহা হইলে উহাব ব্যর্থতাব ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদেব বিপক্ষে আপত্তিই বা টিঁকিবে কি কবিয়া? এবং উদ্দেশ্যগুলিব বৈধতা সম্বন্ধে এযাবৎ প্রগতি বা পুবাগতি কোনও সম্প্রদায়েব তবফ হইতেই কোনও প্রশ্ন শুনিতে পাই নাই।

প্রথম উদ্দেশ্যে যাঁহাবা বিবাহিত হইযাছেন, যদি বিবাহেব পবে এরূপ ঘটে যে, তাঁহাদেব পরস্পবেব মধ্যে দৈহিক মিলন অসম্ভব বা অসঙ্গত হইয়া পডিযাছে, তবে সেক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কবাই স্বাভাবিক। এরূপ ঘটনা সচবাচবই ঘটিতে পাবে। যদি দম্পতীব একজন উন্মাদ অথবা অন্য কোনরূপ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হন, যেখানে দৈহিক মিলন অপবজনেব অথবা সন্তানেব স্বাস্থ্যেব হানিকারক হয়, তাহা হইলেই এরূপ অবস্থাব উদ্ভব হইতে পাবে। অথবা, স্বামী বা স্ত্রী একজন যদি সন্ন্যাসী ও মিলনবিমুখ হন, তাহা হইলেও বিবাহেব প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতবাং এই দ্বিবিধ পবিস্থিতিতেই দম্পতীব মধ্যে যিনি স্বাভাবিক, তাঁহাব পক্ষে বিবাহ বিচ্ছিন্ন কবিবাব অধিকাব থাকা বিধেয়।

বিবাহেব দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি অপেক্ষাকৃত লঘু এবং সেই কাবণে অপেক্ষাকৃত সহজেই সফল হইতে দেখা যায়। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাব না থাকে, সেখানে স্বামীও স্বভাবতঃই স্ত্রীর

গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং স্ত্রীও সাধ্যমত স্বামীকে সেবা-যত্ন হইতে বঞ্চিত করেন না। যদি প্রকৃত সদ্ভাব অর্থাৎ মনের মিল নাও থাকে, তথাপি নিজ নিজ স্বার্থবশে পরস্পর সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলেন। সেইজন্যই এবিষয়ে সাধারণতঃ বিফলতা আসে না, এবং মাত্র এই বিফলতা অবলম্বন করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ পাশ্চাত্যদেশেও কম দেখা যায়। এই কারণ দর্শাইয়া যদি ক্বচিৎ কখনও বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু হয়, তবে বুঝিতে হইবে, প্রকৃত কারণ ইহা নয়, ইহার পশ্চাতে প্রেমের অভাব এবং সম্ভবতঃ অন্য ব্যক্তিতে প্রেমাসক্তি। সুতরাং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ব্যর্থতাকে বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গত অজুহাত বলিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করি না। তবে যে ক্ষেত্রে অসদ্ভাব এত অধিক যে, একে অন্যের প্রতি দৈহিক নির্য্যাতন করিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে নির্দ্দোষপক্ষের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকা আবশ্যক।

তৃতীয় উদ্দেশ্য লইয়া যিনি বিবাহ করেন, প্রথম দুই শ্রেণীর ব্যর্থতার আবির্ভাবে তিনি তত বিচলিত হন না, সুতরাং ঐ কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের কল্পনা তিনি করেন না। প্রেমাস্পদ যদি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তও হন, কিন্তু সে ব্যাধি যদি তাঁহার চরিত্রের কলুষজনিত না হয়, তাঁহার জীবনের উপরে অশ্রদ্ধা জন্মাইবার হেতু না হয়, তবে অপরপক্ষ তাঁহাকে ত্যাগ করিবার কথা মনে আনিতে পারেন না। সন্ন্যাস সম্বন্ধেও ঐ কথা। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উচ্চতর প্রেম আছে, সেখানে একজন ভোগ-বিমুখ হইলেও বঞ্চিতজনের প্রেমে বঞ্চিত হন না। সুতরাং তাঁহাদের

মধ্যে ঐ কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা উঠে না। কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীব ব্যক্তিদিগেব মধ্যেও বিবাহ-বিচ্ছেদেব কাবণ একটি ঘটিতে পারে, তাহা বহুবিবাহ। এক স্বামী বর্ত্তমানে সভ্যসমাজে স্ত্রীব বহুবিবাহেব নিয়ম নাই, সুতবাং স্বামীব পক্ষে এদিক্ দিযা কোনও গোলযোগ নাই। কিন্তু আমাদেব সমাজে পুরুষেব বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। শিক্ষিত সম্প্রদাযে সে বীতি আজকাল অনেক পবিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু আইনবিরুদ্ধ হয় নাই, ফলে, এখনও কোথাও কোথাও এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় দাব-পবিগ্রহেব দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সুতবাং এ বিষয়টি শুধু স্ত্রীব পক্ষ হইতেই বিচাব কবিতে হইবে। যে নাবী প্রথমোক্ত কাবণ দুইটিকেই বিবাহেব উদ্দেশ্য বলিয়া মনে কবেন, তিনি স্বামীব বহুবিবাহে তেমন আপত্তিব কাবণ না দেখিতে পাবেন,—যতক্ষণ স্বামী তাঁহাব গ্রাসাচ্ছাদন ও মিলনস্পৃহা পূর্ণ কবিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহাব পক্ষে বিবাহ ব্যর্থ হইতেছে না। কিন্তু যে নাবী প্রেমকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে কবেন, প্রথম উদ্দেশ্যগুলি ত্যাগ কবিযাও যিনি চলিতে পাবেন, কিন্তু অন্তবেব প্রেমে বঞ্চিত হইলে পাবেন না, তাঁহাব পক্ষে স্বামীব বহুবিবাহ অবশ্যই বিবাহ-বিচ্ছেদেব সঙ্গত কাবণ বলিযা বিবেচিত হইবে। যে স্বামী অন্য নাবীতে অনুবাগ অর্পণ কবিলেন, তাঁহাব সঙ্গে স্ত্রীব প্রাণেব মিলন হয় নাই বুঝা গেল। সুতবাং এরূপ অবস্থায় স্ত্রীব পক্ষে সামাজিক মিলনকেও ছিন্ন কবিবার অধিকাব থাকা সঙ্গত—যাহাতে তিনি অন্য পতি ববণ কবিয়া তাঁহাব প্রেম দ্বাবা নিজেব প্রেম-জীবনকে সার্থক কবিতে পাবেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদেব অধিকাব

কোনও কোনও স্থলে এরূপও দেখা যায় যে, স্বামী আইনতঃ দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু বিবাহ না কবিয়াও অন্য নাবীর প্রেমাসক্ত হইয়া বহিয়াছেন। এরূপ অবস্থায়ও স্ত্রীর প্রেম-জীবন নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং যদি স্বামীব অন্যানুরাগ আইনতঃ প্রমাণিত হয়, তবে স্ত্রীব বিবাহ-বিচ্ছেদেব অধিকাব থাকা ন্যায়সঙ্গত। এটি অবশ্য পুরুষেব পক্ষ হইতেও খাটে অর্থাৎ পত্নী অন্য পুরুষে অনুবক্ত বলিয়া যদি প্রমাণিত হয়, তবে স্বামীও বিবাহ-বিচ্ছেদ কবিবার অধিকাবী।

ব্যক্তিজীবনে বিবাহেব ত্রিবিধ উদ্দেশ্যেব সফলতা দিতে হইলে কোন্ কোন্ অবস্থায বিবাহ-বিচ্ছেদেব অধিকার থাকা নিতান্ত সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয তাহাই আলোচনা কবিয়া দেখিলাম। কিন্তু এই অধিকার প্রদান কবা হইলে সামজিক জীবনে কোনরূপ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় কিনা, অথবা ব্যক্তিজীবনেই অন্য কোনদিকে কোনরূপ অবাঞ্ছনীয় অবস্থাব সৃষ্টি হয় কিনা, তাহা ভাবিবাব বিষয। মানুষেব মন ও জীবন দুই-ই জটিল, এক দিকে বন্ধন খুলিয়া দিতে গেলে অন্যদিকে হয়তো জট পাকাইতে পারে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথার বিবোধিদল সাধারণতঃ একটি যুক্তি দেখাইযা থাকেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহাবা বলেন যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি আইনসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সামান্য অজুহাত অবলম্বন কবিযাই বহু পবিবার বিছিন্ন হইয়া যাইবে, সমাজে যে অশান্তি বর্ত্তমানে আছে, তাহা অপেক্ষা অশান্তি বহুগুণ ব্যাপক হইবে। বর্ত্তমানের অবিচ্ছেদ্য ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রীকে আজীবন এক

হইয়া থাকিতে হইবে জানা থাকাতে তাঁহাবা পরস্পরেব মধ্যে গরমিল থাকিলেও যথাসম্ভব নিজেকে সংযত কবিয়া পবস্পবের সহযোগিতা কবিয়া চলিবাব চেষ্টা কবেন। যদি এই অবিচ্ছেদ্যতা আবশ্যক না হয়, তবে ব্যক্তিগতজীবনে সংযম প্রচেষ্টা শিথিল হইয়া আসিবে, তাহাতে ব্যক্তিব বা সমাজেব কল্যাণ কোথাও নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইঁহাবা পাশ্চাত্যসমাজেব নজিব দেখান।

পাশ্চাত্যজগতেব সামাজিক জীবনেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ পবিচয় নাই, অশান্তি তাহাদেব সমাজে অধিক, কি, আমাদের সমাজে অধিক, তাহাও তুলাদণ্ডে মাপিযা বলিতে পাবি না, কাজেই সে সম্বন্ধে অনুমানেব উপব ভবসা কবিয়া কিছু বলা ঠিক নয়। তবে একথা সত্য যে, ব্যক্তিগত জীবনেব উচ্চ বিকাশেব পক্ষে সংযমেব *একটি* বিশিষ্ট স্থান আছে এবং নিজেব ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে কোথাও লাগাম না লাগাইযা চলিতে দেওযাব রীতি সুরীতি নয। এদিক্ দিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদবীতিব বিপক্ষে যে আশঙ্কা, তাহাব মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। বিবাহ্-বন্ধনকে ইচ্ছা হইলে বিচ্ছিন্ন কবিতে পাবা যায়, এই বোধটি মনে মনে থাকিলে দম্পতীব মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য হইলেই ঐ সম্ভাবনা অগোচবেও উঁকি মাবে; এবং বর্ত্তমানে যেমন মনোমালিন্যকে যথাসম্ভব দূব কবিয়া সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত কবিবাব জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টা থাকে, তখন তাহার পবিবর্ত্তে মনোমালিন্যকে বাড়াইয়া তুলিবাবই সম্ভাবনা অধিক হইবে। মানুষেব মনে স্বার্থ ও অহঙ্কাব স্বভাবতঃই এত প্রবল যে, নিতান্ত না ঠেকিলে ইহাকে অপবেব কাছে খাটো কবিতে

মানুষ কখনও চায় না, ঠোকাঠুকি বাধিলে নিজেকে বড রাখিবাব জন্যই জিদ ক্রমশঃ বাডিয়া যায়। বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহা হইলে স্বামীস্ত্রীর মধ্যেও এইরূপ হইবার সম্ভাবনা। সুতবাং মানুষেব মধ্যে ত্যাগ ও আত্মসংযমেব শক্তি জাগ্রত কবিতে হইলে, অতিশয় গুরুতব কাবণ ব্যতিরেকে বিবাহবন্ধন অবিচ্ছেদ্য থাকাব বীতিই বাঞ্ছনীয। সেইজন্য "incompatibility of temperament মনেব অমিল, অসদ্ভাব প্রভৃতি কাবণগুলি বিবাহ-বিচ্ছেদেব পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা পবিষ্কাব হওযা দবকাব। বিবাহবন্ধনেব যে অবিচ্ছেদ্যতা থাকিলে পতিপত্নীব পবস্পবেব মধ্যে সদ্ভাব বদ্ধমূল থাকা সম্ভব, তাহা আমাদেব দেশে নাবীব পক্ষেই শুধু আছে, পুরুষেব পক্ষে নাই। পুরুষ ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পবিত্যাগ কবিতে পাবে, অথবা অন্য স্ত্রী গ্রহণ কবিতে পাবে। সুতবাং পত্নীব সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যেব জন্য ও তাঁহাব প্রীতিসাধনার্থ যে ত্যাগ ও সংযম স্বীকাব কবা প্রয়োজন, তাহা কবিবাব জন্য পুরুষেব দিকে কোনও তাগিদ্ নাই। সেই কাবণেই আমাদেব সমাজে পুরুষেব জীবনে উহা সচবাচব দেখিতে পাই না। আত্মত্যাগেব সমস্ত বোঝা আসিয়া পুঞ্জীভূত হইযাছে নাবীব উপব। বিবাহ-বিচ্ছেদবিবোধিগণ সংযম-শৃঙ্খলাব যে যুক্তিব অবতাবণা কবিতেছেন, তাহা এরূপ ব্যবস্থায় কখনও কার্য্যকবী হইতে পাবে না। সুতবাং "incompatibility of temperament" জাতীয লঘু কাবণগুলিকে বিবাহ-বিচ্ছেদেব সঙ্গত কাবণ বলিয়া সমর্থন কবিব না তখনই, যখন

পুরুষের একাধিক পত্নীগ্রহণ ও ইচ্ছামত পত্নীত্যাগ আমাদের সমাজে আইন দ্বারা বন্ধ করা হইবে। মাত্র সেইরূপ অবস্থাতেই বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা দম্পতীর মধ্যে উভয় পক্ষ হইতে সদ্ভাব ও সহযোগিতা স্থাপনের পক্ষে অনুকূল হইবে। এবং এই অবস্থাই আমরা কামনা করি।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে লঘু কারণগুলি বর্জ্জন করিলে আর যে কয়টি বাকী থাকিল তাহা (১) দম্পতীর একজনের উৎকট, দুরারোগ্য, বংশানুক্রমিক ব্যাধি, (২) দম্পতীর মধ্যে একজন সন্ন্যাসী অথবা সম্ভোগ বিমুখ, (৩) পত্নী বর্ত্তমানে স্বামীর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ (৪) দম্পতীর একজন অপর স্ত্রীতে, অথবা পুরুষে অনুরক্ত (৫) দৈহিক অত্যাচার। এই কয়টি কারণের প্রত্যেকটিই গুরুতর। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিকে বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গত হেতু বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও কোনও আপত্তি উঠিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, এগুলি কেহ মিথ্যা অজুহাত স্বরূপ সৃষ্টি করিতে পারে না, ইহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ-প্রমাণগোচর। ইহার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের কথা নাই। আত্মসংযমের অভাবহেতু যে ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়াশঙ্কা বিরোধিদল করিয়া থাকেন, তাহার ফাঁকও ইহাতে নাই। অধিকন্তু এরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যে কোনও মামলামোকদ্দমার প্রশ্ন নাই। পিতার মৃত্যুতে পুত্র যেরূপ স্বাভাবিক নিয়মে সম্পত্তিলাভ করে, মৃত জীবনবীমাকারীর পরিবার যেমন সহজ ভাবে আইনতঃ অর্থগ্রহণের অধিকারী হয়, প্রায় তেমনই নিরুপদ্রবে সহজভাবে এই বিবাহ-বিচ্ছেদগুলিও আইনতঃ সম্পন্ন হইতে পারিবে। ইহার মধ্যে সচরাচর কোনও দ্বন্দ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নাই।

এ সম্বন্ধে এইটুকু বলা দবকাব যে, বিবাহ-বিচ্ছেদেব অধিকার আইনানুমোদিত হইবে বটে, কিন্তু ইহা কোনও ক্ষেত্রেই আবশ্যক (Compulsory) হওয়া উচিত নয়। উক্ত কাবণগুলি বিদ্যমান থাকিলেও কোনও স্বামী অথবা স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ না কবিয়াও পাবিবেন। কিন্তু যিনি ইচ্ছা কবিবেন, তিনি যাহাতে অনায়াসে ডিক্রী পাইতে পাবেন এরূপ ব্যবস্থা কার্য্যকবী হওয়া প্রয়োজন, ইহাই আমাদেব বক্তব্য।

চতুর্থ ও পঞ্চম কাবণ দুইটি অপেক্ষাকৃত অপ্রত্যক্ষ এবং বিশদ প্রমাণসাপেক্ষ। সুতবাং ইহা লইয়া বহু গোলযোগ বাধিবাব সম্ভাবনা আছে, এবং এই দুইটি অধিকাবেব ছল ধবিয়া অনেক স্থলে অসদুদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা রুজু হওয়াব আশঙ্কাও কম নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য সমাজে অনেক সময় আমবা দেখিতে পাই। অতএব এই দুইটিকে বিবাহ-বিচ্ছেদের কাবণরূপে গ্রহণ কবা উচিত হইবে কিনা, অথবা কি ভাবে কবা হইবে, তাহা গভীবচিন্তাসাপেক্ষ।

কেন্দ্রীয় পবিষদ্ হইতে যখন বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ে মতামত আহূত হইয়াছিল, তখন কোনও কোনও তবফ হইতে এরূপ পবামর্শ শুনিয়াছিলাম, যেন বিবাহ-বিচ্ছেদেব অধিকাব ও হেতুগুলি পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য হয়। নিছক নীতিব দিক্ হইতে আমবাও এ প্রস্তাব সমর্থন কবি এবং সেইভাবেই ইহাব আলোচনা কবিয়াছি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমাদেব দেশে এমন কতগুলি কুপ্রথা প্রচলিত বহিযা গিয়াছে, যাহাব দরুণ বর্ত্তমানে স্বামী স্ত্রী উভয়কে বিবাহ-বিচ্ছেদেব সমান অধিকাব দিলে নাবীসমাজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত

হইবে। আমবা মনে কবি, পুরুষেব পক্ষে যখন ইচ্ছামত পত্নীত্যাগ অথবা এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণেব প্রথা আমাদের সমাজে আছে, তখন তাহাব পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদেব কোনও অনিবার্য্য কাবণ থাকিতে পাবে না। নাবীব সে অবিকাব নাই, কাজেই তাহাবই নিমিত্ত মাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ হওযা প্রযোজন। স্থতবাং যতদিন ঐ কুপ্রথা দুইটি আইনতঃ বহিত না হয়, ততদিন পুরুষেব পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হওয়াব আবশ্যকতা তো নাই-ই, পবন্তু একদিক্ দিযা নাবীব পক্ষে উহা অতিশয় বিপজ্জনক হইবে।

বিষয়টি হযতো আবও বিশদভাবে বলা দবকাব। আমাদেব দেশে সম্পত্তিতে নাবীব কোনও অধিকাব নাই, উপার্জ্জনেব প্রথা ও পথও অতি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে বর্জ্জন কবিবাব অধিকাব লাভ কবেন, তাহা হইলে সেই পবিত্যক্তা নাবীব ভবণ-পোষণেব ব্যবস্থা কি হইবে? পিতৃ বা স্বামিকুলে কোথাও তাঁহাব আইনতঃ কোনও দাবী বহিল না। যদি পুরুষেব বিবাহ-বিচ্ছেদেব অধিকাব না থাকে তাহা হইলে স্বামী তাঁহাকে পবিত্যাগ কবিতে বা অন্য পত্নী গ্রহণ কবিতে বাধ্য হইলেও পূর্ব্বতন স্ত্রী তাঁহাবই নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদনেব ব্যযনির্ব্বাহে অধিকাবী থাকিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত না নাবীকে সম্পত্তিতে পুরুষেব সমান ব্যক্তিগত অধিকাব দেওয়া হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত স্বামীকে বিবাহ-বিচ্ছেদেব অধিকাব দেওয়া যাইতে পাবে না।

এই সম্পর্কে বিবাহ-বিচ্ছেদেব মধ্যে আরও অনেক জটিলতা দেখা যায। নারীকে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদেব অধিকাব আইনতঃ কাগজপত্রে

দেওয়াও যায়, তবুও তাহা কার্য্যতঃ সফল হইবে না—যতদিন পর্য্যন্ত নাবীকে সম্পত্তি ও উপার্জ্জনক্ষমতায় পুরুষেব সমান সুযোগ না দেওয়া যায। মনে কবা যাউক যেন স্বামী আইনসঙ্গত কাবণে বর্জ্জনীয় সাব্যস্ত হইলেন এবং পত্নী তাঁহাকে বর্জ্জন কবিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তথাপি পত্নী তাঁহাব সহিত বিবাহ বিচ্ছিন্ন কবিতে সাহসী হইবেন না, যদি না তিনি অন্যত্র নিজেব জীবিকাব উপায দেখিতে পান। অন্নাভাবে মরিবাব চেয়ে নাক মুখ গুঁজিয়া ঐ অবাঞ্ছিত স্বামীরই সঙ্গে গ্রন্থি বাখিয়া অভিশপ্ত জীবনটাকে বাঁচাইয়া বাখা অনেক নাবী বাধ্য হইয়া শ্রেয়ঃ মনে কবিবেন। সুতবাং সহজে কোনও নারী বিবাহ-বিচ্ছেদেব শবণ লইবেন না। আইনতঃ সিদ্ধ হইলেও প্রথাটি কার্য্যতঃ অচল হইয়া থাকিবে। সুতবাং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রবর্তিত কবিযা যাঁহারা নাবীজাতিব দুঃখ নিবসন কবিতে চাহেন, তাঁহাদেব সঙ্গে সঙ্গে নারীব উত্তবাধিকাব ও উপার্জ্জনেব যথোচিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনেব প্রতিও সচেতন হইতে হইবে।

আবও একটি কথা আছে। আমাদেব সমাজে অনেক বিষয় আইনেব খাতাব অন্তর্ভুক্ত হইযা আছে বটে, কিন্তু জনসাধাবণেব অন্ধতা ও কু-সংস্কাবেব দরুণ সমাজজীবনে কার্য্যকব হইতে পাবিতেছে না। যথা, বিধবাবিবাহ। কোন্‌কালে বিদ্যাসাগব মহাশয ঐ আইন লিপিবদ্ধ কবাইয়া চলিযা গেলেন, কিন্তু আজও চাবিপাশে ঘবে ঘবেই দেখিতে পাইতেছি, তরুণী বিধবাব ম্লান মুখচ্ছবি। বিধবাকন্যাকে পুনর্ব্বিবাহিত কবাইবার কথা অভিভাবকদেব তো মনেই আসে না, কন্যা যদি আপন ইচ্ছায স্বযংবরা হয়, তাহাতেও অনেকদিন পর্য্যন্ত আত্মীয় ও প্রতিবেশী

মহলে অনুচ্চ আলোচনা চলে। অর্থাৎ বিবাহেচ্ছু বিধবাকে সমাজ ভালো চক্ষে দেখিতে এখনও শেখে নাই। সমাজেব মন হইতে অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি যদি অপসাবিত না কবা যায়, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ-কাবিণীদেব সামাজিক অবস্থাও এইরূপ অথবা ইহা অপেক্ষাও করুণ হইবে। বিচ্ছেদকাবিণী নিবপবাধ নাবীকে যদি সমাজ কুমাবী কন্যাব মত সবলভাবে গ্রহণ কবিতে না পাবে, ও তাহাদেব বিবাহ কবিবাব মত অভিরুচি যদি যুবকদেব মনে না হয়, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ কবিযাও সে নাবী সুখময জীবন যাপন কবিবাব সুযোগ পাইবেন না, সমাজেব শ্লেষবিদ্রূপ এবং নিঃসঙ্গ জীবনেব ব্যর্থতা সহিয়াই তাঁহাকে বাঁচিতে হইবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা জটিল ও বহুব্যাপক। একদিক্ দিয়া টান দিলেই সমাজশবীবেব নানাদিকে টান পড়িবে। এ প্রবন্ধে সামান্য ভাবে দুই চাবিটি বিষয উল্লেখ কবা গেল। কিন্তু ইহাব প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনাব প্রযোজন আছে। সমাজশবীবে নাড়া দিতে যাঁহাবা ভয় পান, তাঁহাবা হয বিবাহ-বিচ্ছেদকে ধামাচাপা দিয়া, নয়তো আনুষঙ্গিক দিক্গুলিব প্রতি চক্ষু বুঁজিয়া শান্তিবক্ষা কবিতে পাবেন। কিন্তু কল্যাণকামীব সে উপায় নাই। নাবীব দুঃখ দূব কবিতে হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদেব অধিকাব নাবীকে দিতেই হইবে, পক্ষান্তরে, যাহাতে দুঃখেব পবিবর্তে আবার অন্যতব দুঃখই আবির্ভূত না হয়, তাহাবও প্রতিষেধ চাই। তাই তাঁহাব চিন্তা ও কর্ম্মের দায়িত্ব গুরুতব।

মেয়েদের শিক্ষা

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া স্ত্রী-শিক্ষা-সংস্কারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র নানাভাবের আলোচনা শুনা যাইতেছে। পূর্ব্বে ইহা সীমাবদ্ধ ছিল জনসাধারণের দুই চারিজনের মধ্যে, কিন্তু ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া কিছুকাল যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রসার আরম্ভ হইয়াছে অতি অল্পকাল পূর্ব্বে এবং এখনও পুরুষের তুলনায় মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিস্তার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহারই মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে এরূপ কলরব কেন উঠিল, দুঃখের বিষয়, তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ বুঝিতে পারি নাই।

কথা চলিতেছে, মেয়েদের শিক্ষিত করিয়া তোলা অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার ধারা একরূপ না হইয়া ভিন্নরূপ হইলেই সমাজের সমধিক মঙ্গল হইবে, অতএব সেইরূপ ব্যবস্থা হউক। রূপটি যে কি হইবে, তাহা এখনও সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং তাহা লইয়াই বচসা, তবে ভিন্ন যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এবিষয়ে মতদ্বৈধ বড় একটা শুনিতে পাই না, এমন কি, মহিলানেত্রীদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাসদস্যদের মুখেও না। শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহা লইয়া আজকাল বিশিষ্টদের মধ্যেও চিন্তার অনৈক্য ও মতান্তর আছে, এবং বোধ হয় সেই কারণেই শুধু স্ত্রীশিক্ষা-সংস্কার নয়, সাধারণ শিক্ষা-সংস্কার লইয়াও এত গবেষণা

উঠিয়াছে। শিক্ষা অর্থে অনেকে মনে কবেন general education অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জন, অনেকে মনে কবেন Vocational training অর্থাৎ অর্থকবী বিদ্যা। আমবা এই দুই অর্থেই নির্ব্বিচাবে 'শিক্ষা' শব্দটি ব্যবহাব কবিয়া থাকি। এবং তাহাতেই অনেক গোলমালেব সৃষ্টি হয। 'শিক্ষা' শব্দটিকে Vocational training অর্থে ধবিযা লওযাতেই আজকাল মেয়েদেব শিক্ষাকে ছেলেদেব শিক্ষা হইতে ভিন্ন পথে চালাইয়া লইবাব চেষ্টা এত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের পবিবর্ত্তে শিক্ষাকে অর্থকবী বিদ্যায় পবিণত কবা আমবা সঙ্গত মনে কবি না। অর্থেব প্রযোজন আছে এবং সেজন্য অর্থকবী বিদ্যা শিক্ষা চাই, সংসাবে গৃহস্থালী দবকাব এবং সেজন্য গৃহকর্ম্ম জানিতে হইবে। কিন্তু যে লোক বোজগাব কবিতে শিখিযাছে অথবা যে মেয়ে গৃহকর্ম্মে নিপুণ, সেই শিক্ষিত, 'শিক্ষা' শব্দেব ইহা অপেক্ষা কদর্থ আব কিছুই হইতে পাবে না। তাহাই যথার্থ উচ্চশিক্ষা যাহা মনুষ্যত্ববিকাশে সহায়তা কবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানেব পথ উন্মুক্ত কবিযা আত্মাকে জাগ্রত কবিয়া তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রধানতম কাজ সেই জ্ঞানেবই বিস্তাব কবা। অর্থকবী বিদ্যাব জন্য যে শিক্ষাব প্রযোজন, তাহাব ভাব পৃথক্ এক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রহণ কবিতে পাবে। অথবা বিশ্ববিদ্যালযেব যদি যথেষ্ট উৎসাহ ও অর্থপ্রাচুর্য্য থাকে, তবে তাঁহাবাও ঐ সব বিভাগেব শিক্ষাব্যবস্থা নিজেব আযত্তাধীনে পৃথক্ভাবে চালাইতে পাবেন। কিন্তু শিক্ষাব এই গৌণ উদ্দেশ্যকে মুখ্য বলিয়া

ধবিয়া লইয়া তদনুসাবে শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত কবিবাব সংকল্প বিশ্ববিদ্যালযেব পক্ষে সমীচীন নয়।

সুতবাং অর্থকবী বিদ্যাব কথা আপাততঃ ছাডিয়া দিলে, পুরুষ ও নাবীর শিক্ষাব মধ্যে বিশ্ববিদ্যালযেব পাঠনীতিতে কোনরূপ তাবতম্য হওয়া অনুচিত। যে জ্ঞান মানবত্ববিকাশেব জন্য প্রয়োজন, সে জ্ঞান পুরুষ নাবীব বিভেদ জানে না। এমন কি, সভ্যজগতেব উপযুক্ত নাগবিক হইয়া জীবনযাপন কবিবাব জন্য যে জ্ঞানেব প্রয়োজন, তাহাও ছেলে ও মেযেব পক্ষে সমভাবেই প্রয়োজন। সুতবাং ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, বাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি বিষযেব মোটামুটি জ্ঞানলাভ প্রত্যেক ছেলে ও মেযেব পক্ষে অবশ্যকবণীয়। ইহার মধ্যে কোন্‌টি লইয়া যে তাবতম্য কবা যাইতে পাবে, বুঝি না। অথচ তাবতম্যেব প্রচেষ্টা হইতেছে। জীবনেব উৎকর্ষ সাধন কবিতে হইলে যে মানসিক সম্পৎ আহবণ কবিতে হয, তাহা প্রাকৃতিক বিধানে পুরুষ ও নারীব জন্য ভিন্ন কবিয়া বাখা হয় নাই। সুতবাং অন্তবজীবনেব সমৃদ্ধি সাধনেব জন্য জ্ঞানেব যে সর্ব্বতোমুখী বিস্তাবেব আবশ্যকতা, মেয়েদেব বেলায তাহাতে এত কার্পণ্য ও কুণ্ঠা কেন? মনেব সমৃদ্ধি সাধনেব জন্য পুরুষেব পক্ষে যে যে পাঠ অবশ্য শিক্ষণীয বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, মেয়েবা তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে কোনমতেই বাজি নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০ সাল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পবীক্ষাব যে নূতন পাঠ্যতালিকা নিরূপণ কবিয়াছেন, সেগুলি ভালো কবিয়া পডিয়া ও ভাবিয়া দেখিলে তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কবা কঠিন হয়। অর্থকবী

বিস্তাব দিকে তাঁহারা যে বেশী ঝোঁক দেখাইয়াছেন তাহা নয়, সাধাবণ জ্ঞানার্জ্জনেব অনুযায়ী বেশীব ভাগ এখনও আছে তবু তাহাব মধ্যে এমন সব পার্থক্য ছেলে মেয়েদেব মধ্যে কবাব চেষ্টা হইয়াছে, যাহাব অর্থ বুঝা যায না। মেয়েদেব জন্য Domestic Science বা গৃহ-কর্ম্ম পাঠ্য কবা হইয়াছে, সেটি মন্দ নয়। কিন্তু উহা যখন অবশ্য-পাঠ্য কবা হয নাই, তখন তাহাকে একেবাবেই Optional Subjects এব তালিকাভুক্ত কবিলে ক্ষতি ছিল না। লাভ হইত এইটুকু যে অঙ্কশাস্ত্র অবশ্যপাঠ্য হইতে পাবিত, যেমন ছেলেদেব জন্য কবা হইযাছে। ছেলেবা অঙ্ক কষিতে পাবে আব মেয়েবা পাবে না, এরূপ একটি ধাবণা অনেকেব মুখে শুনিতে পাই। কিন্তু অভিজ্ঞতায জানি, ছেলেদেব মধ্যে অঙ্ক সম্বন্ধে এমন নিবেট মূর্খ অনেক আছে, যাহাবা Compulsory অঙ্ক উঠিযা গেলে নিঃশ্বাস ফেলিযা বাঁচিত। অথচ সে সুযোগ তাহাবা পায় নাই। তাহাদেব পক্ষে Compulsoryই বহিয়া গেল, মেয়েদেব বেলায় তুলিযা লওযা হইল। অর্থাৎ মনেব যে উচ্চাঙ্গেব শিক্ষাব জন্য ছেলেদেব পক্ষে অঙ্ক অবশ্যশিক্ষণীয বিবেচিত হইয়াছে, মেয়েদের পক্ষে সে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষেব তেমন কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, এই মাত্র বুঝা যায়। এবং এই মনোভাব আবও পবিস্ফুট হইয়াছে প্রাথমিক বিজ্ঞানশিক্ষা (Elementary Scientific Knowledge) ছেলেদেব জন্য অবশ্যপাঠ্য (Compulsory) ও মেয়েদেব জন্য ইচ্ছাধীন (Optional) রাখিয়া। Classical Language সম্বন্ধেও তাই। এখানেও ছেলেদেব সম্বন্ধে অবশ্যশিক্ষণীয়তা,

মেয়েদের বেলা যথা ইচ্ছা। অর্থাৎ মানসিক তীক্ষ্ণতা ও জ্ঞানেব উচ্চতার জন্য ছেলেদেব বেলায় যত দবদ, মেয়েদেব বেলায় তত দবদ কর্ত্তৃপক্ষ দেখান নাই। পক্ষান্তবে আবাব উল্টা ব্যাপাবও দেখা যাইতেছে। Optional Subjects এব তালিকা পডিলে দেখা যায় যে, মেযেদেব জন্য সেলাই একটি বিষযরূপে নির্ব্বাচিত আছে—ছেলেদেব জন্য তাহা নাই। মেয়েদেব জন্য যে সেলাই আছে, এটি খুব ভালো ব্যবস্থা, এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয যে, ছেলেদেব জন্য সেলাইয়েব বিধান না থাকাতে কোনও ক্ষতি হয় নাই, কাবণ ছেলেবা সাধাবণতঃ কখনও সেলাই কবে না। তবে হাতে সেলাই না কবিলেও পুরুষেবা দবজীর দোকান অনেক সময় দিয়া থাকে, সে হিসাবে সেলাই শিক্ষাব একটি সুযোগ তাহাদেব দিলে মন্দ হইত না। কিন্তু তাহাব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, মেয়েদেব জন্য সঙ্গীত ও কলাবিদ্যা (Drawing, Painting and Fine Arts) নির্ব্বাচিত হইযাছে, অথচ ছেলেবা ইচ্ছা কবিলেও এ দুইটি বিষয় শিখিতে পাবিবে না। এ বকম আশ্চর্য্য ব্যবস্থা কেন? ছেলেবা কি মেয়েদেব চেযে সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায কম দক্ষ অথবা কম উৎসাহী? ববঞ্চ কলাবিদ্যায়—যাহাব মধ্যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ইত্যাদিও স্থান পাইয়াছে—পুরুষেবাই এ যাবৎ পৃথিবীব সর্ব্বত্র মেযেদেব তুলনায় অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। তবে এবকম পক্ষপাতী ব্যবস্থা কেন? দেখিযা শুনিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ মনে মনে অনুভব কবিয়াছেন, উচ্চশিক্ষায় ছেলে মেয়েদেব মধ্যে কোনই যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য কবা চলে না, কিন্তু জনসাধাবণের কলকোলাহলে বাধ্য

হইয়া একটা কৃত্রিম পার্থক্যের ব্যবস্থা করিয়া কোনমতে সন্তুষ্ট রাখা।

উচ্চশিক্ষার পরিবর্ত্তে আমরা যদি প্রাথমিক শিক্ষার কথা ধরি—অর্থাৎ যেখানে মনুষ্যত্বের উন্নতবিকাশ ততটা উদ্দেশ্য নয়, যতটা উদ্দেশ্য কোনরকমে অক্ষর পরিচয় করাইয়া চল্‌তি পৃথিবী সম্বন্ধে দুই চার কথা জানিবার সুযোগ দেওয়া, যাহাতে প্রচলিত সমাজজীবনে বেশ সুচারুভাবে সংসার চালানো যায়—তাহা হইলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থায় খানিকটা তারতম্য করা ভালো। কারণ, আমাদের বর্ত্তমান প্রচলিত সমাজে ছেলেদের কর্ম্মক্ষেত্র ও মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক্—একেবারে দেওয়ালের এদিকে আর ওদিকে, প্রকাণ্ড ব্যবধান। সেখানে যার যার কর্ম্মক্ষেত্র অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। (এ যাবৎ যেরূপ সমাজব্যবস্থা পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত ছিল, তাহাতে পুরুষ বাহিরে গিয়া উপার্জ্জন করিবে এবং নারী ঘরে বসিয়া গৃহস্থালী করিবে, ও পুরুষের চিত্তবিনোদন করিবে, এইরূপই কর্ম্মবিভাগ ছিল বটে—কিন্তু বর্ত্তমানজগতে এরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। বরং নারীও রীতিমত উপার্জ্জন করিবে, অন্ততঃ তাহার প্রয়োজন হইতে পারে, ইহাই ক্রমশঃ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।)—কিন্তু উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সে কথা খাটে না, কারণ তাহার উদ্দেশ্য মানুষ তৈরী করা। সমাজ চিরদিন এক পদ্ধতিতে চলে না। যে সমাজ পুরাতন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকেই করজোড়ে মানিয়া লওয়া জড়বুদ্ধির কাজ, উচ্চশিক্ষিত জীবন্তমনের পরিচয় তাহা নয়। সে উন্নততর আদর্শের

প্রয়োজনে বারে বারে সমাজ ভাঙ্গে ও গড়ে। সমাজব্যবস্থা অনুসারে তাহার শিক্ষা নিয়মিত হয় না, তাহার শিক্ষিত মনের বিচার দ্বারাই সমাজের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। সেইরূপ বিচারবুদ্ধিশীল, মনুষ্যত্ব-পূর্ণ ছেলেমেয়ে তৈরী করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ।

এগুলি গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ক কয়েকটি কথা। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও অনেক তরফ হইতে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক প্রকার অনুযোগ উঠিতেছে। মোটামুটি সে সকলের সার মর্ম্ম এই :—(১) নারীর প্রধান দায়িত্ব পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব, অতএব সেই দায়িত্ব সুনির্ব্বাহ করিবার জন্য তদুপযোগী শিক্ষাই নারীর মুখ্য প্রয়োজন, অন্য শিক্ষা গৌণ। (২) উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা মেয়েরা বিলাসিতাপরায়ণ হইয়া থাকেন এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং শিক্ষাধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহার গতি রোধ করা হউক।

(১) পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা বলিতে ইঁহারা কি বুঝেন ও বুঝাইতে চাহেন, তাহা পরিষ্কার জানি না। বৈজ্ঞানিক বিচারে বলিতে হয়, যৌনবিজ্ঞান, ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু-মনোবিজ্ঞান শিক্ষাই পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের একমাত্র উপযোগী শিক্ষা যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু সংস্কারোন্মুখ ব্যক্তিগণ কি মহিলা-শিক্ষা-ধারায় ইহাই প্রবর্ত্তিত করাইতে চান? আমার নিশ্চিত ধারণা তাহা নয় ররং তাঁহারা অধিকাংশই শিশু-মনোবিজ্ঞানকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার হাস্যে উড়াইবেন এবং যৌনবিজ্ঞান-শিক্ষার নামে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব বলিতে বুঝেন—পাতিব্রত্য, সন্তানপালন ও গৃহস্থালী। পাতিব্রত্য সম্বন্ধে বিস্তর বাগবিতণ্ডা উঠিতে

পারে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে চাহি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে মোটের উপর ইহাই বলি যে, জ্ঞানের বিকাশ, বিজ্ঞানের শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের স্ফুরণ যে নারীর মধ্যে হইয়াছে, পতির প্রতি ও সন্তানের প্রতি যথোচিত আচরণ এবং গৃহকর্ম্মের সুনিপুণ ব্যবস্থা তাহার সহজেই অভ্যাসসিদ্ধ, পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের দৃষ্টি যাহার খোলে নাই, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা যাহার মধ্যে হইবার অবকাশ পায় নাই, পাঠশালায় বসাইয়া তোতাপাখীর মত নানা বিধিবিধান মুখস্থ করাইলেই সন্তান পালনের যোগ্যতা তাহার হয় না, এবং বারংবার 'পতি পরম দেবতা' আবৃত্তি করাইলেও স্বামীর প্রতি প্রকৃত প্রেম জাগে না। নারীর 'পত্নীত্ব' ও 'মাতৃত্ব' লইয়া যাঁহারা অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব গোটা মনুষ্যত্বের এক একটি অংশ মাত্র, তত্তৎ শিক্ষা দ্বারা জীবনের সম্পূর্ণতা আসে না, বরং মানব জীবনকে সম্পূর্ণ করিবার উপযোগী মনুষ্যত্বের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলে পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব সহজেই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং শিক্ষাবিধায়কগণের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত সেই শিক্ষা-বিতরণ যাহাতে সমাজের প্রত্যেক নারী ও পুরুষ জ্ঞানে ও চরিত্রে এক একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইবার সুযোগ লাভ করে।

(২) মেয়েরা আজকাল বিলাসিতা করিয়া থাকেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহাতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মেয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছুই দেখি না। রাস্তায় বাহির হইয়া যখন দেখিতে পাই, বিচিত্রবসনা তরুণীরা চলিয়াছেন, তখন বেশভূষা দেখিয়া চিনিবার

উপায়ই থাকে না, ইহার মধ্যে কোন্‌টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ-উপাধি-ধারিণী আর কোন্‌টি চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই পাঠ সাঙ্গ করিয়াছেন। সুতরাং শিক্ষিতে অশিক্ষিতে বিলাসিতার তফাৎ কিছুই নাই, তফাৎ যা কিছু আছে গ্রাম্য ও শহুরে মেয়েতে। অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে বর্ত্তমান বিলাসিতার কোনও সম্পর্ক নাই, আসল কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, এবং ইহাকে মেয়েদের শিক্ষা-সংকোচ দ্বারা নিরসন করা যাইবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমের রাজনীতিক অধীনতাপাশে যখন জড়াইয়া পড়িয়াছি, তখন প্রভুজাতির প্রভাব কাটাইয়া উঠাও সহজ-সাধ্য নয়। —আর এক কথা। মেয়েরা বিলাসিতা করিতেছে শুধু বর্ত্তমান যুগে নয়, আবহমান কাল হইতেই পুরুষকর্ত্তৃক তাহাদের বিলাসিনী সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। পার্থক্যের মধ্যে এই দেখি যে, সাজসজ্জার প্রকারভেদ হইয়াছে, পূর্ব্বে মেয়েরা পায়ে আলতা পরিতেন, এখন তৎস্থলে জুতামোজা পরেন, পূর্ব্বে তাম্বূলরঞ্জিত অধর দেখা যাইত, এখন সে স্থলে লিপ্‌ষ্টিক মাখা হয়, পূর্ব্বে ভারি ভারি গহনা ও বেনারসীর বাহুল্য ছিল, বর্ত্তমানে অলঙ্কার হাল্কা হইয়াছে ও বেনারসীর স্থান অধিকার করিয়াছে জর্জ্জেট। হাসিবার কথা নয়, কিন্তু বাস্তবিক প্রভেদ শুধু এইটুকু। ইহার মধ্যে শিক্ষার অপবাদ আসে কেন? কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রের মারফৎ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, যে বিগত নিখিল-ভারত-শিক্ষা-সম্মেলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি স্বীয় অভিভাষণে বলিয়াছেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা তিনি খুবই পছন্দ করেন, কিন্তু আজকাল উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা যে কেশরাশি 'বব্‌' করিয়া ফেলিতেছেন ও পুরুষের মত চুরুট ফুঁকিতেছেন, ইহা বড়ই অবাঞ্ছনীয়,

সুতরাং এরূপ শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তন হওয়া বিধেয়। —আশ্চর্য্য হইয়াছি এই জন্য যে, মেয়েদের 'বব্' করার ও চুরুট খাওয়ার মধ্যে এমন কি যুক্তি তিনি দেখিলেন যাহাতে তাহাদের শিক্ষাধারা পরিবর্ত্তিত হওয়ার প্রস্তাব উঠিতে পারে। 'বব্' করা বা চুরুট খাওয়া আমি সমর্থন করিতেছি, ইহা কেহ মনে করিয়া লইবেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই কথা যে, মেয়েদের বিধাতৃদত্ত কেশরাশি ছাঁটিয়া ফেলার মধ্যে যাঁহারা নৈতিক অবনতি ও চরিত্রের লঘুতা দেখেন, পুরুষে চুল ছাঁটিলে বা জটা-শশ্রুবিমণ্ডিত না থাকিয়া প্রকৃতিদত্ত কেশসম্ভার একেবারে মুণ্ডন করিয়া ফেলাতে কখনও তাঁহারা অপরাধ গণ্য করিয়াছেন কি? চুরুট খাওয়া যদি গর্হিত কর্ম্ম হইয়া থাকে, তবে অসংখ্য পুরুষ যে চুরুট সেবন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের উচ্চশিক্ষাকে রোধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে কি? যাহা অন্যায়, তাহা প্রত্যেকের পক্ষেই অন্যায়। পাশ্চাত্য বেশভূষা ও আচরণ অনুকরণ করা যদি ভারতবাসীর পক্ষে অবৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তবে তাহার প্রতিবিধান পুরুষনারীনির্ব্বিশেষেই করিতে হইবে, সেজন্য বিশেষভাবে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা-সংকোচের কোনও অর্থই হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে পুরুষ ও নারীকে বিচার করিবার জন্য এক নৈতিক মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় না। এত গোলযোগের সৃষ্টি সেই জন্যই।

নানা দিক্ দিয়া নানাভাবে চিন্তা করিয়াও ছেলেদের বাদ দিয়া বিশেষ ভাবে মেয়েদের শিক্ষা-সংস্কারের কোনই প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। তবে এ আন্দোলন উঠিতেছে কেন, তাহাই ভাবি। বিগত অল্প কয়েক বৎসরেরই অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে

যে, নাবীব মস্তিষ্কশক্তি পুরুষের চেয়ে ন্যূন নয় , আরও দেখা যাইতেছে, সমান শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ কবিয়া নারী সামাজিক, রাজনৈতিক সর্ব্ববিষয়ে পুরুষেব সমকক্ষতা ও সমানাধিকাব দাবী করিতেছে, এবং মনুষ্যোচিত জ্ঞান ও শক্তি বলে বলশালী হইলে নাবীব সেই দাবী ও স্বাধীনতা খর্ব্ব কবিবাব কোনও উপায় সমাজেব হাতে আব থাকিতেছে না। আশঙ্কা হয, হয়তো বা ইহাই এই শিক্ষাসংকোচক আন্দোলনেব প্রকৃত গূঢ় কাবণ।

নারীর মাতৃত্ব ও মাতৃত্বের শিক্ষা

অস্পষ্টতার একটা মোহ আছে। এই জন্য অনেকে সূর্য্যালোকের চেয়ে চন্দ্রালোক বেশী ভালোবাসে। তাহা ছাড়া, সুবিধাও আছে অনেক। পরের এবং নিজের চক্ষুকেও বেশ ভুলাইয়া রাখা যায়, অস্পষ্ট আলো-আঁধারে বস্তুর যাথাতথ্যকে আবৃত করিয়া বিকৃত করিয়া ইচ্ছামত রূপ দেখা যায়।

আমাদের আশেপাশেও প্রত্যহ তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। নারীর মাতৃত্ব ইহার অন্যতম উদাহরণ। মাতৃত্ব নারীমনের সহজ আকাঙ্ক্ষা, মাতৃত্বেই নারীত্বের সর্ব্বোত্তম বিকাশ ও সার্থকতা, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি নারীজীবনের পক্ষে যোগ্য হইতেছে না, ইহার পরিবর্ত্তে তাহাদের জন্য মাতৃত্বোপযোগী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা হউক—শুনিয়া শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইতেছে। পুরুষদের কথা দূরে থাক, আমাদের মহিলাদের কাহারও লেখনীতেও যে একটুখানি নূতনতর কথা অর্থাৎ স্পষ্ট সত্য কথা শুনিয়া কর্ণকুহর জুড়াইব, সে আশাও দেখি না। অগত্যা বাধ্য হইয়াই লেখনী ধরিতে হয়।

মাতৃত্ব লাভ করা নারীর সহজাত আকাঙ্ক্ষা, এই কথাটি আবহমান কাল হইতে প্রচারিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে নারীজাতি মা হইয়া থাকে বলিয়া যদি মাতৃত্বের প্রতি তাহাদের অভিলাষ সূচিত হয়, তবে

আমরা একথাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, সেই নিয়মানুসারে পুরুষজাতিরও পিতৃত্বের প্রতি একটি সহজাত আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু আসল কথা ইহার কোনটিই প্রকৃত সত্য নয়। সত্য শুধু এই যে, নর ও নারী উভয়েই নিজ নিজ দৈহিক আবেগের প্রেরণায় পরস্পর সম্মিলিত হয় এবং সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে ইহারই অনিবার্য্য ফলরূপে। মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব কামনা করিয়া তাহারা মাতা পিতা হয় না। ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ, আদিম বর্ব্বরতার যুগে যখন মানুষ জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিল, দৈহিক মিলন তখনও সংঘটিত হইয়াছে, এবং সন্তানের জন্ম তখনও চলিয়াছে। পশু সমাজেও তাই। আর বর্ত্তমানের সুসভ্য সমাজে যখন আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানে বহুদর্শী ও চরিত্রে সংযত হইতে শিখিয়াছি, তখনও অধিকাংশ মানুষই সন্তানের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার চেয়ে আপন আপন ভোগস্পৃহা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সন্তানের জন্মদান করিয়া থাকে বেশী। মুখে স্বীকার করিতে অনেকে হয়তো লজ্জিত হইবেন, কিন্তু মনে মনে প্রত্যেক দম্পতীই ইহা মানেন। সন্তান লাভ করিবার কামনায় এবং সন্তানের দ্বারা সমাজকে সমৃদ্ধ করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে যদি দম্পতী পিতৃত্ব-মাতৃত্বের অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে Eugenics-এর জ্ঞান সমাজমধ্যে আর একটু বেশী প্রচলিত দেখিতাম, এবং আমাদের দেশে যে স্বাস্থ্যহীন, অর্দ্ধমৃত, পঙ্গু শিশুসংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, ও তাহাদিগকে খাইতে পরিতে না দিতে পারিয়া দরিদ্র পিতামাতা উদ্বন্ধনে আত্মঘাতী হইতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি দেখিতাম না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া নরনারী সন্তানসৃজনকার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে

সহাযতা কবে বটে, কিন্তু স্বীয় মনোভাবে ঐ উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইযা উহা কবে না। সুতরাং মাতৃত্ব নাবীমনেব সহজাত আকাঙ্ক্ষা বলিলে ভুল বলা হয়। স্বভাবেব মধ্যে মূলতঃ যাহা আছে, তাহা মিলনস্পৃহা মাত্র, পববর্ত্তীকালে ফলাফলেব সঙ্গে মিলাইযা মাতৃত্বেব লোভ বলিয়া যে কথাটি প্রচাব কবা হইযাছে, তাহা সংস্কাব। আব যদি ভোগাকাঙ্ক্ষাকেই অপবোক্ষমনেব অজ্ঞাত মাতৃত্বাকাঙ্ক্ষা নাম দিয়া নাবীব স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয, তবে পুরুষমনকেও সেইভাবে পিতৃত্বেব অভিলাষী বলিয়া মনে কবিতে হইবে। তবে শিশুব জন্ম ও শিশু-জীবনেব কিছুদূব পর্য্যন্ত মাতাব দান ও দায়িত্ব পিতাব চেয়ে অনেক বেশী, এই কাবণে প্রাকৃতিক বিধানে নাবীব দেহমন পুরুষেব অপেক্ষা কোমলতব উপাদানে গঠিত এবং অধিকতব স্নেহপ্রবণ। স্নেহ, সেবা, ও ভালোবাসাব প্রয়োজনে সর্ব্বস্বত্যাগ—এইগুলি নারীজীবনেব মহনীয় বিশেষত্ব। যাঁহাবা সচবাচব নাবীব মাতৃত্বগৌবব প্রচাব কবিয়া থাকেন, তাঁহাবা সম্ভবতঃ এই গুণগুলিকেই মাতৃত্ব বলিযা মনে করেন। তাহা কবিলে ভাবেব দিক্ দিয়া তাঁহাবা তেমন ভুল কবেন নাই, কিন্তু ভাষাব দিক্ দিয়া গণ্ডগোলেব সৃষ্টি কবিয়াছেন। কাবণ মাতৃত্বের প্রয়োজনে ও-গুলিব উদ্ভব হইযা থাকিলেও ঐ গুলি মাতৃত্বেব আকাঙ্ক্ষা কখনই নয। সহজ হৃদয়বত্তাব গুণে নাবী স্বভাবতঃই ভালোবাসাব বস্তু চায়, সেবা কবিবাব সুযোগ খোঁজে , কিন্তু সে-ভালোবাসা নিজ গর্ভজাত সন্তানেব উপরেই নিবদ্ধ নয। নিজের শিশু না থাকিলেও সে অপবাপবকে সেই স্নেহে অভিষিক্ত কবে ও তাহাতে তৃপ্ত হয়। নারীর মনে বাস্তবিক যাহা আছে, তাহা নিজেব দেহ হইতে সন্তান উৎপন্ন

করিবার আকাঙ্ক্ষা নয়, মানুষকে নিজস্ব করিয়া ভালোবাসিবার প্রবৃত্তি, এবং এই আকাঙ্ক্ষা নিজের সন্তান-সন্ততির উপরেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যদি উদারতর করিতে করিতে জগৎময় ছড়াইয়া দিবার সুযোগ নারী পায়, তবেই নারী-প্রেমের সার্থকতা যথার্থ হয়।

মাতৃত্বেই নারীজীবনের সর্ব্বোত্তম বিকাশ ও সার্থকতা—এই যে কথাটি, ইহা আরও ভ্রমাত্মক। সত্য কথা বলিতে কি, নারীজীবনকে বিকশিত ও সার্থক হইতে না দিবার পক্ষেই ইহা বরঞ্চ বেশী সহায়তা করিতেছে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মাতা হওয়া নারীর স্বাভাবিক জীবনের একটি অংশ মাত্র (যেমন পিতা হওয়া পুরুষের জীবনের অংশবিশেষ), কিন্তু ইহা তাহার সমগ্র জীবন নহে। ধরা যাউক, সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত যে নারী বাঁচিল, এবং হয়তো আট দশটি সন্তানের মাতা হইল, সন্তানধারণ ও লালনের জন্য প্রাকৃতিক যে প্রয়োজন তাহাতে সর্ব্বসমেত পনেরো বৎসরের মত সময় লাগিল, বাকী পঞ্চান্ন বৎসর সে কি? মাতৃত্বের প্রাকৃতিক কর্ত্তব্য হইতে যখন সে মুক্ত, তখন তাহার জীবনের নারীত্ব অর্থাৎ অস্তিত্ব কি লইয়া? বস্তুতঃ, নারীর ব্যক্তিগত জীবন অবিকল পুরুষেরই তুল্য, শুধু তাহাকে পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় সন্তানের জন্য ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের দায়িত্ব কমে না। মিলনস্পৃহার ফলে সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে, ইহাতে নিন্দনীয় যেমন কিছুই নাই, তেমনই গৌরব করিয়া সিংহাসনে তুলিবারও প্রয়োজন দেখি না। ইহার মধ্যে ভালোমন্দ বড় বিশেষ নাই। অতএব নারীর পক্ষে বিশেষভাবে সন্তানসৃজনের মাহাত্ম্য প্রচার করিবারও কোনও যুক্তি

দেখি না। নারীত্বকে যাঁহারা মাতৃত্বের সহিত সমার্থক করিয়া ফেলেন (অথচ 'নরত্ব'কে 'পিতৃত্বে'র সঙ্গে করেন না), তাঁহারা নারীশব্দের ঈপ্-প্রত্যয়টুকুই শুধু দেখিতে পান, মূল 'নর'-শব্দটিকে আমলে আনেন না, অর্থাৎ নারীর মধ্যে 'স্ত্রী'-ত্বের প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি, মনুষ্যত্বের প্রতি দৃষ্টি আদৌ নাই। যেমন, স্ত্রী হরিণ, স্ত্রী-কোকিল, স্ত্রী-হস্তী ইত্যাদি, তেমনই একটি স্ত্রী-লোক, যাহার মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গই প্রধান, লোক অপ্রধান। পশুতে ও মানুষে যে বিরাট্ পার্থক্যটি আছে, এবং পুরুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম-আদি বিষয়ে যাহা গৌরবের সহিত স্বীকার করা হয়, নারীর বেলায় তাহা একেবারে বিস্মরণ। জীবকুলের বিবর্ত্তনের মধ্যে একটি দিক্ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণতঃ, নিম্নতম স্তর হইতে জীব যতই ঊর্দ্ধতর স্তরে উঠিতেছে, তাহার মধ্যে সন্তানসৃজনের কালব্যবধান ততই দীর্ঘতর হইতেছে, সন্তানের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ জীবের ব্যক্তি-জীবন যত অধিক পরিস্ফুট হইতেছে, জাতিজীবনের প্রাধান্য তত কমিতেছে। সেইজন্য মানুষের জীবনে সন্তানসৃজনের প্রাধান্য অনেক কম এবং তাহা অনেক পরিমাণে মানুষের স্বেচ্ছাধীন। পশুর তুলনায় মানুষ স্বাধীন এবং মানুষের মধ্যেও অসভ্যদিগের তুলনায় বর্ত্তমান সুসভ্য সমাজের এ বিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ সংযমশক্তি অনেক বেশী। উন্নত মানুষ জাতিজীবনের প্ররোচনায় ব্যক্তিজীবনকে খাটো করিতে রাজি নয়, তাই তাহার দেহমনের অধিকাংশ শক্তিকে উন্নততর পথে রূপান্তরিত করিয়া ব্যক্তিজীবনকে সমৃদ্ধ করিবার কাজে লাগাইতে ব্যস্ত। নারীর সার্থকতাকেও এই মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতে

হইবে। এই হিসাবে আজ যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহার মাতৃত্বকে অযথা জয়গানে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া সমস্ত মনকে সন্তানসৃজনের অভিমুখী করা নয়, বরঞ্চ ঐ কুসংস্কার হইতে মনকে মুক্ত করিয়া দৃষ্টিকে মনুষ্যত্বের উচ্চপথে ফিরাইয়া দেওয়া। নারীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, পশুজাতির মত শুধু আহার বিহার ও সন্তানসৃষ্টিই তাহার জীবনের কাজ নয়, উহা গৌণ, তাহার আসল বিকাশ হইবে জ্ঞানের গভীরতায়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, কর্ম্মের সবলতায় ও হৃদয়ের বিশালতায়। বুঝাইতে হইবে যে, নিজ গর্ভজাত সন্তানকে লইয়া সঙ্কীর্ণ গৃহগণ্ডীতে তাহার প্রেমকে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখাতে কোনও মহত্ত্ব নাই, বরং উহা আসক্তিতে প্রেমকে আবিল করে, জগতের সমস্ত সন্তানদলের, সকল মানুষের প্রতি ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারিলে তবেই তাহার প্রেমের সার্থকতা।

কিন্তু সন্তানকামনার ফলে না হইলেও স্বকৃত কার্য্যের ফলে সন্তানের জন্ম যখন হইয়াই থাকে, তখন তাহার দায়িত্ব পিতামাতাকে লইতে হইবে বৈকি? শিশুর জন্মদান করিয়াই তাঁহারা খালাস হইতে পারেন না, মানুষের মত করিয়া তাহার শরীর মনের পরিপুষ্টি সাধনের ভার তাঁহাদিগকে লইতে হইবে। এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শিশুর জন্ম ও জন্মের পর অব্যবহিত কিছুকালের জন্য লালনপালনব্যাপারে পিতার অপেক্ষা মাতার দায়িত্ব অধিক, সুতরাং সেই পরিমাণে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা সন্তানসম্বন্ধে কিছু বেশী দৃষ্টি দিতে হইবে। যাঁহারা নারীর পক্ষে মাতৃত্বের শিক্ষা বিধান করিতে ব্যস্ততা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মনে নারীজীবনের শুধু এই দিক্‌টিই সর্ব্বদা জাগরূক থাকে বলিয়াই ঐরূপ করেন। তবে তাঁহারা অপর কোন দিক্ দেখিতে পান না এবং

এই দিক্‌টিও এলোমেলো ভাবে দেখেন বলিয়া এ বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান অতিক্রম কবিযা থাকেন। যাহা হউক, মাতৃত্ব ও পিতৃত্বেব যে দায়িত্ব আছে তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ কবিতে হইলে ভবিষ্যৎ-পিতামাতার পক্ষে কতগুলি শিক্ষা গোড়া হইতেই থাকা দবকাব, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শিশুকে সম্পূর্ণ মানবত্বে বিকশিত কবিতে হইলে তাহাব যে দ্বিবিধ পবিস্ফুবণেব প্রয়োজন—দেহেব ও মনেব,—তদনুযায়ী পিতামাতাব শিক্ষাকেও দুইটি ধাবা অবলম্বন করিতে হয়, শিশুব শবীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। শিশুব দৈহিক পবিপুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পিতাব চেয়ে মাতাব সম্পর্ক বেশী, মনোগঠনে উভযেবই দায়িত্ব সমান। সুতবাং সন্তানেব প্রতি দাযিত্ব হিসাব কবিযা যদি পুরুষ-নাবীব শিক্ষাব বন্দোবস্ত কবিতে হয, তাহা হইলে একমাত্র শিশু-পালনেব একটি পাঠ নাবীশিক্ষাব তালিকাব মধ্যে অতিবিক্ত আনিবাব প্রয়োজন, অন্য কিছুতেই কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি কবিবাব দবকাব দেখিনা। যাঁহাবা মাতৃত্বেব উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণযন কবিবাব জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহাবা এ বিষযটি ভাবিয়া দেখিবেন। গৃহকর্ম্ম ও মাতৃত্ব এক জিনিষ নয়, এবং বন্ধনকুশলতা বা পবিবাবেব সেবাশুশ্রূষা কবাও মাতৃত্ব নয। এগুলি সামাজিক ব্যবস্থায মেযেদেব জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে, অথবা নাও পাবে—সে প্রশ্ন তুলিতেছিনা,—কিন্তু ইহা মাতৃত্বেব সহিত একার্থক নয়, একথাটি সকলেব পবিষ্কাব বুঝিয়া দেখা উচিত ; এবং মেযেদেব পক্ষে মাতৃত্বেব দায়িত্বই মাত্র অপবিবর্ত্তনীয়, সামাজিক ব্যবস্থাদি মানুষেব খুসীমত তৈয়াবী হইয়াছে, ইচ্ছা কবিলে ও প্রয়োজন হইলে মানুষ তাহাকে

ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে। সুতরাং ওগুলিকে সনাতন মনে করিয়া তাহার উপর অতটা জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তাহাতে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া যায়। এমন যে পরিবারপ্রথা যাহাকে মানুষ চিরন্তন মনে করিতে শিখিয়াছিল, তাহারও যে শিকড় উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া নূতন সমাজব্যবস্থা চলে, তাহাও যখন বর্ত্তমানে চক্ষুর সম্মুখে দেখা যাইতেছে, তখন বুঝা যায়, পিতামাতাকে যে আমরা শিশুর চিরকালের অভিভাবক ও পরিপোষক মনে করিয়া তদনুসারে পিতৃত্ব-মাতৃত্বের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে বসিয়াছি, তাহারও মূল কতখানি শিথিল।

যাহা হউক, বর্ত্তমান পরিবারপ্রথাকে স্বীকার করিয়াই দেখাইয়াছি যে, তাহাতেও পিতৃত্বের শিক্ষা ও মাতৃত্বের শিক্ষার মধ্যে ব্যবধান খুব কমই। তাহা ছাড়া, আরও একটি গুরুতর কথা। কেবলমাত্র শিশু মনোবিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারাই শিশুর মনকে সুগঠিত করা যায় না। সন্তানকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে পিতা ও মাতা উভয়কে এক একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইবে। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে শুধু পুঁথিপাঠে কেহ মানুষ হয় না। পিতামাতার দৈহিক বীজ অবলম্বন করিয়াই শিশুর জন্ম, এবং পরিবারপ্রথা যতদিন থাকিবে ততদিন পিতামাতার জীবনের শিক্ষাই তাহার চরিত্রের উপর প্রধানতম প্রভাব, সুতরাং পিতামাতা উভয়েই যদি স্বাস্থ্যে, চরিত্রে ও জ্ঞানে মনুষ্যোচিত না হন, তবে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হইবার কথা নয়। মাতার সহিত শিশুর দেহের সম্পর্ক ও বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় তাহার পারিবারিক সম্পর্কও পিতার অপেক্ষা বেশী, সুতরাং ভবিষ্যৎ মাতাকে অর্থাৎ দেশের নারীসমাজকে স্বাস্থ্যে ও জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধ

করিয়া তোলার প্রয়োজন আরও বেশী। অথচ, আমাদের সমাজে নারীজাতির স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি ও যত্ন কেহ একেবারেই করেন না এবং যাঁহারা মাতৃত্ব-শিক্ষার পক্ষপাতী, তাঁহারা মেয়েদের জ্ঞানানুশীলনকে অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মা যেখানে অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সন্তানদল সেখানে চিন্তা ও জ্ঞানের কুশলতায় জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে, মা যেখানে সহস্র জুজুর ভয়ে সদা কম্পমান, পুত্রগণ সেখানে বীর সৈনিক হইয়া দেশোদ্ধার করিবে, এরূপ আশা তাঁহারা কেমন করিয়া করেন বুঝি না। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা মেয়েদের মাতৃত্বের মহিমা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশী উচ্চকণ্ঠ, তাঁহারাই মেয়েদের কুসংস্কারমোচন ও জ্ঞানের বিস্তার করিতে বেশী অনিচ্ছুক এবং মেয়েদের ভীরুতা অপসারণ ও সাহসের সহিত জনারণ্যের মাঝখানে কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে দিতে অসম্মত।

এই সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখি,—নারীর পক্ষে মাতৃত্বই শ্রেষ্ঠ গৌরবময় আদর্শ, এই কথা প্রচার করাও যেমন অর্থহীন ও ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর, মাতৃত্বদায়িত্বের দোহাই দিয়া নারীর উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন বন্ধ করিয়া গৃহকোণে বসাইয়া রাখিবার প্রস্তাবও তেমনই যুক্তিবিরুদ্ধ এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়তঃই অনিষ্টকর। শিশুর জীবনোন্মেষের দায়িত্ব মাতার হাতে রাখিতে হইলে নারী-জাতিকে প্রকৃত মনুষ্যজাতিতে পরিণত করিতে হইবে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের উপায় জ্ঞানের উচ্চতা, কর্ম্মের বহুমুখীনতা ও হৃদয়ের ব্যাপ্তি ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই।

নারী ও উপার্জ্জন

আমাদের দেশে নারীর কর্ম্ম এযাবং অন্তঃপুরের মধ্যে অর্থাৎ স্বামী সন্তানাদির সেবাযত্ন ইত্যাদির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ কেহ কেহ উপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইউরোপে ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই নারীর উপার্জ্জনের সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সম্প্রতি আবার জার্ম্মানীপ্রমুখ কোনও কোনও দেশে সে অধিকার কাড়িয়া লইয়া বন্ধনশালায় পুনঃপ্রবেশ করাইবারও চেষ্টা চলিতেছে। রাশিয়ায় নারীর উপার্জ্জনের অধিকার সম্পূর্ণ আছে, শুধু আছে বলিলে ভুল বলা হয়, প্রত্যেক নর ও নারীরই উপার্জ্জন প্রায় বাধ্যতামূলক। যাহা হউক, বিভিন্নদেশে বিভিন্নরূপ প্রথা প্রচলিত, কিন্তু মোটের উপর দেখা যায় যে, নারীর পক্ষে স্বোপার্জ্জন বিধেয় ও শ্রেয়ঃ কিনা, অথবা কোন্ পথে কতটুকু বিধেয়, ইহা লইয়া মানবসমাজে চিন্তার স্থিরতা নাই, যে স্থিরতা পুরুষের সম্বন্ধে অনাদি কাল হইতে আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষকেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে অথবা যে কোনও উপায়ে অর্থের মালিক হইতে হইবে (অকর্ম্মা জমিদারপুত্র হইয়া হইলেও আপত্তি নাই), এ বিষয়ে যেমন কোনও দেশে কোনও যুগে কোনরূপ প্রশ্ন শুনা যায় নাই, নারীর সম্বন্ধে তেমনটি নয়। সুতরাং আমাদের দেশে নারীর অর্থোপার্জ্জনপ্রচেষ্টার এই যে নূতন প্রচলন হইতে আরম্ভ

করিয়াছে, এই উপলক্ষে বিষয়টির আলোচনা করিয়া দেখা মন্দ নয়। উপরে 'মানব সমাজে' শব্দটি লিখিয়া একটু ভুল বলা হইয়াছে, কারণ এ সমস্যাটি সমস্ত মানবসমাজের নয়, ইহা শুধু ভদ্রসমাজের, মধ্যবিত্ত সমাজের এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহারা উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের সমাজের। ভদ্রতার গর্ব্বে যাহারা গর্ব্বী নয়, সেই সব দরিদ্র জনগণের মধ্যে ইহার কোনও প্রশ্ন উঠে না, তাহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়াই যথাশক্তি উপার্জ্জন করে। পুরুষ-নারী ঘটিত সামাজিক ব্যবস্থার বৈষম্য-বিভ্রাট্ সকল দেশেই উচ্চতর শ্রেণী সমূহের মধ্যেই বিসদৃশভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে, এস্থলেও তাহাই। সুতরাং তাহাদের দিক্ দিয়াই আমরা আলোচনা করিব।

যে সব মেয়েরা আজকাল আমাদের দেশে উপার্জ্জনে রত হইতেছেন, তাঁহারা অধিকাংশই আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য দায়ে পড়িয়া, অথবা অবিবাহিতাগণ সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য সখ করিয়া উহা করিতেছেন এবং যে সব পুরুষ অভিভাবক ঐ কার্য্য অনুমোদন করিতেছেন, তাঁহারাও ঐ দুই কারণেই। নতুবা বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা, আর্থিকভাবে সচ্ছল কিংবা অসচ্ছল, সকল অবস্থাতেই পুরুষের মত নারীরও উপার্জ্জন কর্ত্তব্য, এরূপ বোধে চাকুরী করিতেছেন এমন মেয়ের সংখ্যা বোধ হয় বেশী নাই, এবং পুরুষের মধ্যে ইহার সমর্থক একান্তই বিরল।

পুরুষেরা যে নারীর উপার্জ্জনপ্রচেষ্টাকে সাধারণতঃ ভালো মনে করেন না, তাহার প্রধানতঃ দুই কারণ। মনোবৃত্তির তারতম্য অনুসারে দুই শ্রেণীর পুরুষ এই দুইটি কারণ গ্রহণ করিয়া থাকেন,

অথবা প্রত্যেক পুরুষই অল্পবিস্তব এই দুই কাবণেরই বশবর্ত্তী হইয়া নাবীব উপার্জ্জনে বাধা প্রদান কবেন, তাহাও অসম্ভব নয়। প্রথম শ্রেণী মনে কবেন, নাবী স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক নিয়মানুসাবে প্রত্যেক নাবীকেই মধ্যে মধ্যে অসমর্থ হইয়া পডিতে হয়, সুতবাং উপার্জ্জনেব ক্লেশ তাহাবা সর্ব্বদা বহন কবিতে সক্ষম হয় না, অতএব নাবীকে উপার্জ্জনেব দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়াই বিধেয়। বাধাহীন পুরুষ অর্থোপার্জ্জনেব দায়িত্ব গ্রহণ করুক, নাবী গৃহেব অভ্যন্তবে অপেক্ষাকৃত অল্পশ্রমসাধ্য কার্য্য লইযাই থাক্। ঘব ও বাহিব উভয লইয়াই যখন পৃথিবী, তখন এইভাবে উভয়বিধ কাজ ভাগ কবিযা লইলেই সমাজ চলিবে ভালো। (অবশ্য এই মনোভাব হইতে নাবীকে উপার্জ্জনেব পথ হইতে নিবৃত্ত বাখিযা বাখিয়া অবশেষে বর্ত্তমানে আবও একটি ধাবণা প্রসূত হইয়াছে যে, স্ত্রী-কন্যাকে উপার্জ্জনে বত হইতে দিলে আভিজাত্য খর্ব্ব হইবে, অর্থাৎ সমাজ মনে কবিবে পুরুষটি বুঝি যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষম নয়, সুতবাং সমাজেব চক্ষে তাহাব সম্ভ্রমেব লাঘব হইবে)। দ্বিতীয় শ্রেণীব মনোভাব নিকৃষ্টতব। তাঁহাবা নাবীকে নিজ নিজ সম্পত্তি বলিয়া মনে কবিযা থাকেন এবং আশঙ্কা কবেন যে, নাবীকে অর্থেব উপব অধিকাব দিলে সে স্বাধীন হইয়া উঠিবে, যে অপবিহার্য্য গ্রাসাচ্ছাদনেব জন্য তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পুরুষেব মুখাপেক্ষী হইয়া এবং ফলে বাধ্য হইয়া থাকিতে হয়, তাহা আব সেরূপ থাকিবে না। তাই তাঁহাদের ভয়, স্বোপার্জ্জনেব অধিকাব ও সুযোগ পাইলে 'নাবী'রূপ সম্পত্তিটি বুঝি বা হাতছাডা হইয়া যায়।

বাস্তবিক, নাবীকে অন্দবমহলে বসাইয়া বাখা ও অর্থেব অধিকাব হইতে বঞ্চিত কবাব মূলে স্বার্থ ও পবার্থমূলক এই দুই প্রকাব কাবণই বর্ত্তমান ছিল। অনেক লেখকলেখিকাব প্রবন্ধে এমন একটু আভাস পাওয়া যায়, যেন এক অভিশপ্ত দিনে পুরুষেবা যুক্তি কবিয়া নাবীব স্বাধীনতা হবণ কবিবাব উদ্দেশ্যেই নাবীব হাত হইতে উপার্জ্জনেব ক্ষমতা কাড়িয়া লইল। সমগ্র পুরুষ-সমাজেব বিরুদ্ধে একপ অভিযোগ আবোপ কবা আমবা যুক্তিসঙ্গত মনে কবি না। পক্ষান্তবে, সনাতনপন্থী যে সকল পণ্ডিতপ্রবব প্রচাব কবিয়া থাকেন যে, নাবীকে দেবীব আসনে বসাইয়া পূজা দিবাব অভিপ্রায়েই পুরুষ তাহাকে সমস্ত ক্লেশকব কর্ত্তব্য হইতে মুক্তি দিয়া অন্তঃপুবেব মণিকোঠায় স্থান নির্দ্দেশ কবিযাছে, তাঁহাদেব উক্তিও সমানই ভ্রান্ত। আসল কাবণ দুইয়েবই সংমিশ্রণ। পুরুষদেব মধ্যে কেহ কেহ যথার্থই নাবীব কোমলতাব প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া ঐরূপ ব্যবস্থাব অনুমোদন কবিযাছেন, ইহাব সুদূব ফলাফল কি হইবে তাঁহাদেব চিন্তায় আসে নাই, অপব একদল নিতান্ত স্বার্থবুদ্ধি প্রবোচিত হইয়া এই বিধিনিষেধেব সৃষ্টি কবিযাছেন, আবাব কেহ কেহ আছেন যাঁহাবা নাবীকে ভালোবাসেন, কিন্তু সম্পত্তিহিসাবে ভালোবাসেন—যেমন বডলোকদেব মধ্যে অনেকে সখ কবিয়া কুকুব বিডাল পুষিয়া থাকেন, সেগুলিকে সত্য সত্যই ভালোবাসেন, যথাসাধ্য আদব যত্ন কবেন, মবিয়া গেলে চোখেব জলও পড়ে, কিন্তু সেগুলি থাকিবে হাতেব মুঠাব মধ্যে, বসিতে বলিলে বসিবে, ইচ্ছামত সঙ্গে কবিয়া বেড়াইতে লইয়া গেলে যাইবে, খাইতে দিলে খাইবে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আদর কবিলে লেজ নাড়িবে।

নারী ও উপার্জ্জন

নারীকে যাঁহারা ভালোবাসেন অথচ স্বাধীনতা দিতে চাহেন না বলিয়া উপার্জ্জনের অধিকার দিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের আলোচনাই আগে করি। নারীর স্বাধীন জীবিকার পথ খুলিয়া গেলে সে আর স্বামী, পিতা প্রভৃতির কথা মানিবে না এই যে ভয়, ইহা একটু হাস্যকর, কারণ, উপার্জ্জক পুত্র বা কনিষ্ঠভ্রাতা পিতা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে মান্য করিবে না—এই অমূলক ভয়ে কখনও তো পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে কেহ উপার্জ্জনের অধিকার ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার কথা মনে আনেন না। বাস্তবিক, বয়োজ্যেষ্ঠকে শ্রদ্ধা বা মান্য করা উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে না, উহা সামাজিক রীতি। তবে ন্যায্য অন্যায্য সকল আদেশ ও খেয়ালকেই যে নির্ব্বিচারে মানিয়া যাইতে হইবে, এরূপ বাধ্যতা উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির উপরে খাটানো যায় না, পুরুষেরও না নারীরও না, এবং না খাটাই মঙ্গল। নারীর যে সর্ব্বদা সকল ক্ষেত্রে পুরুষের অনুগত থাকাই চাই, এরূপ যুক্তিহীন সংস্কার যাঁহাদের নাই তাঁহারা ইহা স্বীকার করিবেন। বরঞ্চ, অর্থের উপর অধিকার পাইলে নারীগণ যে প্রয়োজনমত পিতাপতিপুত্রের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে কার্য্যতঃ অধিকারী হইবে, সমাজের সুনীতির দিক্ দিয়া ইহা একটি লাভের বিষয়। যাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, স্বাধীনতা লাভ করিলে পত্নী স্বৈরাচারিত্বের সুযোগ পাইবে ও হয়তো নিজ নিজ পতিতে সম্যক্ অনুরক্ত থাকিবে না (এবং এই আশঙ্কাই অধিকাংশ পুরুষের মনে গোপনে জাগে), তাঁহাদিগকে শুধু একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাস্য যে, ধরিয়া বাঁধিয়া যে প্রেম, সে প্রেমের মূল্য কতটুকু? যে স্বামী মনে করেন, ফাঁক পাইতেছে না বলিয়া

তাঁহাব পত্নী অপব পুরুষকে ভালো না বাসিয়া তাঁহাকে ভালোবাসে, পত্নীব প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাঁহাব তো নাই-ই (আমাদেব দেশে বোধ হয শতকবা নব্বই জন পুরুষই পত্নীকে ও তথা স্ত্রীজাতিকে শ্রদ্ধা কবেন না), পবন্তু তিনি নিজেব প্রতিই বিশ্বাস হাবাইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি অন্তবে অনুভব কবেন যে, পত্নীব ভালোবাসা অর্জ্জন কবিবাব ও অক্ষুণ্ণ বাখিবাব মত আন্তবিক ভালোবাসা তাঁহাব নিজেব অন্তবেই নাই। মনস্তত্ত্বেব একটি তথ্য এখানে উল্লেখ কবা অবাস্তব হইবে না যে, যাহাব নিজেব গোপন মন যত অধিক কামনাকলুষিত, অপবকে প্রণয়ব্যাপাবে কলুষিত বলিয়া সে-ই তত অধিক অযথা সন্দেহ কবিযা থাকে। বিশেষতঃ, কোনও সভ্য পুরুষ যদি ইহাই বিশ্বাস কবেন যে, তাঁহাব স্ত্রী তাঁহাব অন্নবস্ত্রেব ভিখাবী বলিয়াই প্রাণপণ কবিযা তাঁহাব মন যোগাইতেছে, তাঁহাব প্রতি অনুবাগ আছে কিনা সন্দেহ অথচ আবামে থাকিবাব আশায় তাঁহাকে খুসী বাখিবাব চেষ্টা কবিতেছে, তাহা হইলে তেমন ভালোবাসা লাভ কবিযা সে পুরুষ সন্তুষ্ট থাকেন কেমন কবিযা? যাহাদেব আমবা দেহবিক্রয়ী পতিতা বলিয়া ঘৃণা কবিয়া থাকি, তাহাদেব সহিত এরূপ স্ত্রীব সাদৃশ্য দেখিয়া সুসভ্য মন কি শিহবিযা উঠে না? পবস্পবের প্রেম সেইখানেই শুধু সত্য ও স্বর্গীয়, যেখানে ভালো না বাসিবাব ও বিচ্ছিন্ন হইবাব সহস্র সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসা বিনষ্ট হয় না।* অতএব যে সব পুরুষ নাবীব উপার্জ্জনেব বিপক্ষে উপবোক্ত যুক্তি বা আশঙ্কা মনেব কোণেও স্থান দিযা থাকেন, তাঁহাদেব পক্ষে বডই লজ্জার কথা।

কিন্তু এ গুলি গেল নাবীর স্বোপার্জ্জনেব পক্ষে নেতিমূলক সমর্থন, অর্থাৎ উপার্জ্জনেব অধিকাব দিলে কোন্ কোন্ ভযেব আশঙ্কা নাই, তাহাবই বিবৃতি। অধিকাব না দেওযাব দরুণ যে সমাজেব কতখানি অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, সে সংবাদ প্রায় সকলেব অলক্ষ্যেই বহিয়া গিযাছে। সেই কথাটিই এখন আমাদেব বলিবাব বিষয়, কাবণ ইহাই গুকতব। সেটি নাবীজাতিব আত্মিক অধঃপতন এবং ফলতঃ সমগ্র সমাজের বংশানুক্রমিক পঙ্গুতা। পুরুষ তাহাব বক্ষযিতা, পুরুষ তাহার ভর্ত্তা সুতবাং কর্ত্তা, পুকযেব অনুগ্রহ ব্যতীত তাহাব জীবনধারণেব পন্থা নাই, এই উক্তি ও আচবণ প্রত্যেক নাবী জীবনেব প্রাবম্ভ হইতে এবং জীবনেবও চেযে পূর্ব্ব ইতিহাসে অর্থাৎ মাতা, মাতামহীদের জীবনে শুনিতে শুনিতে ও দেখিতে দেখিতে এমন মজ্জাগত ভাবে গ্রহণ কবিযাছে যে, ইহাব অন্যথা সে ধাবণা কবিতে জানে না। শুধু বাহিবেব জীবনযাত্রায় নয়, তাহাব অন্তবেব গভীবতম স্থান পর্য্যন্ত এই শিক্ষা ও সংস্কাব এমন প্রগাঢ় ছাপ আঁকিয়া বাখিয়াছে যে, সে স্বভাবতঃই আজ অনুভব কবে—সে অবলা। এই মিথ্যা দুর্ব্বলতার গ্লানি তাহাব আত্মাকে আচ্ছন্ন করিযা দিয়াছে, কোনও উন্নত মানসিক চেষ্টা, কোনও ঊর্দ্ধগতিব প্রেবণা তাহাব জাগে না, কদাচিৎ জাগিলেও মাথা তুলিতে ভয পায়, জানে ইহা তাহাব সাধ্যেব অতীত—কাবণ, সে অবলা। মানবাত্মাব যে সর্ব্বোত্তম উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠার নাম মোক্ষ অথবা মুক্তি, পবনির্ভবশীল নারীব অন্তব বাহিবকে ঠিক তাহার বিপরীত ভাবটি গ্রাস কবিয়া আছে। যে আত্মা বলহীন দ্বাবা লভ্য নয়, আমাদের সমাজেব নাবীব জীবনে বলহীনতাব সংস্কারই সেই আত্মার

চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া এই আত্মদৈন্যের মারাত্মক ফল মনস্তত্ত্ববিদগণের অবিদিত নয়। ইহা ব্যতীত আরও অনিষ্ট অপরদিকে এই হইতেছে যে, পুরুষের উপর নিজ জীবনের সমস্ত ভার নিশ্চিন্তমনে চাপাইয়া দিবার অধিকার পাওয়াতে নারীর মনে দায়িত্বহীনতার একটি লঘুভাব স্বচ্ছন্দে আসন করিয়া লইয়াছে। উপার্জ্জন করিতে শক্তি ও পরিশ্রম যে কতখানি প্রয়োজন, তাহার কোনও যথার্থ অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া স্বামী ইচ্ছানুরূপ গৃহাড়ম্বর বা বস্ত্রালঙ্কারের সাধ মিটাইতে না পারিলেই কটূক্তি ও কলহ করিতেও তাহার বাধে না। ফলতঃ, পুরুষ অধিকাংশস্থলেই নারীকে মনে করে বোঝা। এই দায়িত্বহীন লঘুতা মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া নারীর দ্বিতীয় অধোগতি। উপার্জ্জনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নারীকে পুরুষের পোষ্য বানাইয়া রাখাতে আজ আমাদের সমাজে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারেই—'ভার্য্যা' ও 'ভৃত্য' একার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের জীবনকে নিজে পালন করিবার অধিকার ও দায়িত্ব হইতে বঞ্চিত হইলে যে কিরূপ শোচনীয় দুর্গতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান পরাধীন ভারতবর্ষের নৈতিক, সামাজিক সর্ব্ববিধ দুর্দ্দশা দেখিয়াই অনুধাবন করা সহজ হইবে।

যাঁহারা নারীর প্রতি অনুকম্পাভরে নারীজাতির সর্ব্ববিধ ভরণ-পোষণের ভার স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের ঔদার্য্যের প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁহাদের প্রেরণা মহৎ হইলেও বিচারের ধারায় একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। পশুপাখী পোষা আর মানুষ পোষা ঠিক এক পদ্ধতিতে হয় না। পশুপাখীর মানসিক বা আত্মিক জীবনের দায়িত্ব

নাই, তাহাদেব দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান কবিতে পাবিলেই সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু মানুষ যখন পৃথক্ বকমেব জীব, যাহাব জীবভাগেব সঙ্গে দেবভাগ আসিয়া মিলিযাছে, আত্মা ও মন আসিয়া দেহেব সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, শুধু যুক্ত হইয়াই শান্ত হয় নাই, একটি অতি প্রধান অংশ অধিকাব কবিযা লইযাছে, তাহাব সহিত আচবণও তখন পৃথক্-বকমেবই হইতে হয। মানুষ তাই শুধু দেহেব আবাম লইয়া সুখী ও সার্থক হইতে পাবে না। তাহাব জীবনকে সফল কবিয়া তুলিতে হইলে আভ্যন্তবীণ বিকাশেব পথ বাধামুক্ত কবিয়া দিতে হয়। অথচ নাবীকে স্বাবলম্বনেব দাযিত্ব ও অধিকাব হইতে বঞ্চিত কবিযা তাহাব মানসিক ও আত্মিক জীবন কেমন কবিয়া অলক্ষ্যে অধঃপতিত কবা হইতেছে, তাহা দেখাইয়াছি। সুতবাং যাঁহাবা নাবীজাতির প্রকৃত হিতৈষী, তাঁহাবা তাহাব আত্মনির্ভবশীলতাব পথ কখনও রুদ্ধ কবিতে পাবেন না। তবে নাবী স্বভাবতঃ পুরুষেব চেয়ে দেহশক্তিতে দুর্ব্বল এবং তাহাকে মাতৃত্বজনিত নানারূপ বাধাব সম্মুখীন হইতে হয়, এই কাবণে তাহাদিগকে উপার্জ্জনক্লেশ হইতে দূবে বাখিবাব যে ইচ্ছা, ইহার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে বটে। কিন্তু নাবীকে লঘুতব কাজে নিয়োজিত বাখিয়া যথাসম্ভব কায়ক্লেশ হইতে বক্ষা কবাব ইচ্ছা যাঁহাদেব আন্তবিক, তাঁহাদেব পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক প্রচেষ্টা হইতে পাবিত, সামাজিক আইনবিধি এরূপভাবে নিযন্ত্রিত করা যে, বিবাহমাত্রই প্রত্যেক নাবী স্বামীব উপার্জ্জন ও সম্পত্তিব অর্দ্ধাংশেব সম্পূর্ণ মালিক হইবাব অধিকার লাভ কবে। নারী যদি পুরুষেব অর্দ্ধাঙ্গিনী, এবং সন্তানপালন প্রভৃতি সাংসাবিক কাজগুলি যদি সমাজেব পক্ষে অতিপ্রযোজনীব হয,

তবে উহাব উপযুক্ত পাবিশ্রমিক হিসাবে এ দাবী বিবাহিতা নাবীব পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায্য। এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে প্রত্যেক বিবাহিতা নাবীই বাহিবেব উপার্জ্জনচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া সম্পূর্ণভাবেই সংসাবেব আভ্যন্তবীণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পাবিত, অথচ তাহাব আত্মনির্ভব ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইত না। বর্ত্তমান আইনব্যবস্থায় স্বামীব অন্নে নাবীব একটি অধিকাব স্বীকৃত আছে সত্য, কিন্তু তাহাব সহিত ইহার প্রভেদ আকাশ-পাতাল। স্বামীব অত্যাচাবহেতু যদি স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হয় এবং যদি সে স্ত্রী ঐ অত্যাচাবেব সত্যতা ও গুরুত্ব আইন-আদালতে প্রমাণ কবিতে পাবে, তবেই মাত্র অতি সামান্য যৎকিঞ্চিৎ ভাতা তাহাব জন্য নির্দ্ধাবিত হইযা থাকে, যে অর্থ সে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহাব কবিতে পাবে। নতুবা, স্বামিগৃহে স্বামীব এক কপর্দ্দকেব উপবও হস্তক্ষেপ কবিবাব অধিকাব তাহাব নাই। এবং আইনগ্রাহ্য অত্যাচাব ব্যতীত প্রতিদিবসেব প্রতি আচবণে পত্নীব প্রতি যে অবিচাব ও অবজ্ঞা ও সঙ্গে সঙ্গে দুই মুষ্টি অনুগ্রহেব দান বর্ষিত হয় এবং যাহাব ফলে তিলে তিলে নাবীব আত্মিক দৈন্য প্রসাবিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাব কোনও প্রতীকাব নাই। আমবা স্বামীব উপার্জ্জন ও সম্পত্তিব উপব পত্নীব যে অধিকাবের প্রস্তাব ইঙ্গিত কবিলাম, ইহাতে প্রতীকাব অতি সহজে হইতে পাবে। (নাবীব উত্তবাধিকাব বিষয়ক প্রবন্ধ এটি নয়, প্রসঙ্গতঃ একটি ইঙ্গিত দেওযা হইল মাত্র)। যাঁহাবা নাবীব প্রতি সহানুভূতিবশতঃ তাহাব স্বোপার্জ্জনেব পথ রুদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহারা এ-ব্যবস্থায় আপত্তি কবিবাব কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইবেন না, কাবণ, ইহা একদিকে যেমন স্বভাবকোমল

নাবীব কায়িক আবাম অক্ষুণ্ণ বাখিতে পাবে, তেমনই আত্মনির্ভব-বোধেব পথও বন্ধ কবে না। অন্যথা পত্নীব পক্ষে উপার্জ্জনচেষ্টা ছাড়া গত্যন্তব নাই। এই গেল বিবাহিতাদেব কথা। কিন্তু অবিবাহিতাদেব পক্ষে মাতৃত্ব-দাযিত্বেব প্রশ্ন নাই, সুতবাং তাহাদেব উপার্জ্জনে আপত্তি তুলিবাব কোনও যুক্তিসঙ্গত কাবণ দেখা যায় না। ববঞ্চ ইহাই বলা যায যে, উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিবাহেব পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপার্জ্জনে ব্যাপৃত থাকাই তাহাদেব পক্ষে সমযেব প্রকৃত সদ্ব্যবহাব। বসিয়া বসিয়া পিতা ভ্রাতাব উপার্জ্জনেব অর্থ ধ্বংস কবিবাব ও বিলাসব্যসন চঞ্চলতায় কালক্ষেপ কবিবাব পবিবর্ত্তে ইহাতে কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও নিজেব স্কন্ধে দায়িত্ব গ্রহণেব শক্তি বাড়িবাব সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কথা, নাবীকে গুরুতব দৈহিক পবিশ্রম হইতে বাঁচাইবার জন্য যাঁহাবা ব্যস্ত, তাঁহাবা সম্ভবতঃ লক্ষ্য করেন না যে, আমাদেব সমাজে মধ্যবিত্ত পবিবাবেব মেযেবা প্রত্যূষ হইতে বাত্রি পর্য্যন্ত যে সকল শ্রমকব দৈহিক কাজে নিযুক্ত থাকে, স্কুল কলেজেব শিক্ষকতা, আফিস আদালতেব কর্ম্মচাবীব কাজ, ওকালতী, ডাক্তাবী, দবজীব কাজ, চাযেব দোকানে, হোটেলে পবিবেশকেব কাজ ইত্যাদি, বর্ত্তমান জগতেব বহুবিধ উপার্জ্জনেব কাজেই দেহেব শ্রম তাহা অপেক্ষা কম ছাড়া বেশী নয। সুতরাং ওকথা খাটে না। তাহা ছাড়া, নাবীকে অবলা মনে করিয়া অতি সযত্নে সঙ্গোপনে তাহাকে বাঁচাইবাব জন্য অন্তঃপুব নামক সঙ্কীর্ণ পরিধিব মধ্যে লজ্জাশীলতা, শান্তশিষ্টতা নামক ততোধিক সঙ্কোচক গুণাবলীব আবেষ্টনে তাহাব যে স্থান নির্দ্দেশ কবা হইয়াছে, তাহাতে কৃত্রিম উপায়ে নাবীকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতব কবিয়া তোলা হইতেছে।

নারী

একশ্রেণীর স্থূলদর্শী বিজ্ঞজন নাবীর উপার্জ্জনপ্রচেষ্টাব বিরুদ্ধে আব একপ্রকাব যুক্তিব অবতাবণা কবিয়া থাকেন। তাঁহাবা বলেন, দেশে তথা সমগ্র পৃথিবীতে আজ বেকাবসমস্যা দিনে দিনে এমনিতেই এত বেশী বাড়িয়া চলিয়াছে যে, ইহাব উপবে আবাব সঙ্কীর্ণ চাকুবীর বাজাব নাবীবাহিনী আসিযা আক্রমণ কবিলে সমস্যা শোচনীয হইয়া উঠিবে। কথাটি হঠাৎ শুনিতে বেশ। কিন্তু তলাইযা দেখিলে বলিতে হয যে, পৃথিবীব বুকেব উপবে শুধু পুরুষ নামক জীবশ্রেণীই নড়াচড়া কবে না, সমানসংখ্যক অথবা ততোধিক নাবীও বিচবণ কবিতেছে, গ্রাসাচ্ছাদনজন্য অর্থেব প্রযোজন ,শুধু পুরুষেবই নয়, নারীবও সমানই , স্থতবাং বেকাব সমস্যা অর্থাৎ নিজেব ভবণপোষণেব উপযুক্ত অর্থ যোগাইতে না পাবিযা অপবেব গলগ্রহ হইয়া বসিয়া থাকাব সমস্যা শুধু পুরুষেব দিক্ হইতে দেখিলেই চলে না, নাবীব দিক্ হইতেও একইভাবে দেখা দবকাব। সামাজিক প্রথাব বলে নাবী সমাজকে বাধ্যতামূলক বেকাব বানাইযা বাখিয়া যাঁহাবা সমস্যাটিকে সবল কবিয়া লইবাব চেষ্টা কবিতেছেন, তাঁহাবা অজ্ঞাতসাবে নিজেকে চক্ষুঠাব দিতেছেন মাত্র।

প্রচলিত সামাজিক বীতিনীতি মানুষেব মনে এমনভাবে সংস্কাব গাঁথিয়া দেয় যে, তাহাব অন্যথা কল্পনা কবাও অনেকেব পক্ষে দুঃসাধ্য , সমাজশবীবে সামান্য একটু আঘাত দেওয়াও তাহাবা মহাপাতক মনে কবিয়া শিহবিয়া উঠে। নাবীব উপার্জ্জনপ্রসঙ্গেও তাহাব চেয়ে অন্য কিছু আশা কবিতে পাবিনা। এমন কি, ইহাও সম্পূর্ণ জানি যে, আজ যদি নাবীর পক্ষে উপার্জ্জনকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া

আইন জারি করা হয়, তবে শুধু পুরুষ কেন, অধিকাংশ নারীই সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠিবেন। কারণ, পুরুষের উপরে দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আরামে কাল কাটাইতে কাটাইতে তাঁহারা এমনই দায়িত্বহীনতা অভ্যস্ত করিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহাদের অন্তরজীবনের যে কি অধোগতি হইয়া চলিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন তাঁহারা বোধ করে না, এবং সংস্কারকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইলে যে সবল মনুষ্যত্বের প্রয়োজন তাহাও অনেকেরই মধ্যে নাই। কিন্তু সমাজ হিতৈষিগণ মনে রাখিবেন, সমাজরূপ একটি যন্ত্রকে চিরাচরিত ধারায় চালাইয়া লইবার জন্য নরনারী রূপ কলকব্জার সৃষ্টি হয় না, প্রত্যেক নর ও নারীর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক ক্রমবিবর্ত্তনের ও ঊর্দ্ধগতির উদ্দেশ্যেই, তাহারই অনুকূল করিয়া সমাজযন্ত্রকে বারে বারে পরিবর্ত্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়।

আধুনিক প্রেমের কথা

প্রিয়ববাসু,

তোমাব চিঠি পেযে ব্যথিত হযেছি। কি বলে সান্ত্বনা দেব জানি না। যাঁকে একান্ত বিশ্বাসে ভালোবেসেছিলে, তিনি সে বিশ্বাস বাখ্‌লেন না—এব চেয়ে বড বেদনা আব কিছু নেই।

কিন্তু যদি অনুমতি কব, তবে একটা কথা বলি। তাঁর এ অবিশ্বস্ততা অথবা লঘুচিত্ততা তোমাব কাছে যেমন অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত ঠেকছে, অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও কিন্তু ততটা অপ্রত্যাশিত আমাব কাছে লাগে নি। বন্ধু বলে আমাব কাছে এই ব্যথাব দিনে তুমি বল চেযেছ, তাই এ বিষযে কযেকটা স্পষ্ট কথাকে স্পষ্টতব কবে লিখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। মন যখন শান্ত কর্ত্তে পাববে, তখন সেগুলো ভেবে দেখো। হযতো বা খানিকটা সান্ত্বনা পেতেও পাবো।

তুমি লিখেছ, তোমাব সব চেযে বড দুঃখ ও বড বিস্ময এই—নিজে থেকে এমন কবে অযাচিত ভালোবাসা দিয়ে কেন তিনি অকস্মাৎ অকাবণে সরে দাঁড়ালেন। এই পলাযন তোমাকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দিচ্ছে বুঝতে পাবি, কিন্তু আমি বলি ভাই, আজকেব দিনে পুরুষেব পক্ষে এই পলায়ন যে খুব স্বাভা[illegible]

কেন ?—বলি।

একটি কথা গোডাতে মনে বেখো, আমাদেব বর্ত্তমান সমাজে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে-সব মেশামিশি ও ভালোবাসাবাসি দেখতে পাও,

তার সবগুলোকেই সত্যিকারের ভালোবাসা বলে ভুল করে বোসো না। শস্তা ছাপাখানার কল্যাণে আজকাল বাংলার মাটি ফুঁড়ে আনাচে কানাচে নানাবিধ প্রেমসাহিত্য গজিয়ে উঠেছে, সিনেমার হল্ শুধু কলকাতার সহরে নয়, প্রত্যেক মফঃস্বল সহরেরও পল্লীতে পল্লীতে চক্ষু কর্ণকে সুলভে প্রেমান্বিত করবার অধিকার পেয়েছে, এই সব কারণে ছোঁয়াচের গুণে আজকালকার ছেলেমেয়েদের প্রেমে পড়া একটা ফ্যাশান্। যে প্রেমে পড়ে না, সে বড় সেকেলে। তুমি রাগ কোরো না,—তোমার কথা বলছি না, যাঁকে ভালোবেসেছ তাঁর কথাও হয়তো নয়, কারণ তাঁর সম্বন্ধে আমার সবিশেষ কিছুই জানা নেই। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গেই বল্‌ছি যে, দু'চারটি মহানুভব ব্যতিক্রম ব্যতীত আর যত পুরুষের ভালোবাসার কথা ও কাহিনী শুনতে পাও, তার শতকরা নব্বইজন আসলে একেবারেই ভালোবাসে না, ভালোবাসা-ভালোবাসা খেলা করে মাত্র। বিশেষ ভাবে পুরুষের সম্বন্ধেই একথা বল্‌ছি, কারণ, মেয়েরা যারা খেলায় যোগ দেয়, তারা বেশীর ভাগই বাস্তব মনে করে নামে, খেলা ভেবে নয়। তাই অবশেষে পলায়নের তামাসাটা বুঝতে পারে না, না বুঝে কাঁদে। যেমন আজ তুমি কাঁদ্‌ছ।

নব্যশিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি শ্রেণী মোটামুটি দেখ্‌তে পেয়েছি,—এক, যারা কিছুকাল কলেজে পড়েছে ও ইউরোপীয় সাহিত্যকদের উপন্যাসাদি গোগ্রাসে গিল্‌ছে, এবং পণ্ডিত না হয়েও পণ্ডিতম্মন্য হয়েছে, তারা, দ্বিতীয়, যারা যথার্থই চিন্তাশীল এবং এত বেশী চিন্তাশীল যে চিন্তার নেশা ভূতের মত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রথম দলের কথাই আগে একটু বলি। এরা নানাবিধ

তথ্য শুনেছে ও পড়েছে, কিন্তু আয়ত্ত কর্ত্তে পারেনি কোনটাই, কারণ সে ধীরতা, গভীরতা বা মনস্বিতা নেই। তারা ফ্রয়েড্ শিখেছে, জেনেছে—ভালোবাসা অর্থ সম্ভোগপ্রবৃত্তি এবং ঐ প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া বড়ই অন্যায়, সুতরাং তরুণী মেয়ে পথে পড়লেই একটুখানি প্রেম না করা ক্লীবত্ব। অতএব যাকে-তাকে কাছে পেলেই যখন-তখন একটু ভালোবেসে ফেলে। জানিনা তোমার প্রিয়তম যিনি, তিনি এই শ্রেণীভুক্ত কিনা। তুমি হয়তো বলবে—না। না হলেই মঙ্গল।

দ্বিতীয়, যাঁরা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ নামে সম্মানিত, তাঁদের এর চেয়ে একটু তফাৎ আছে। এঁদের মধ্যে সম্ভোগলিপ্সা উৎকট নয়, উচ্ছৃঙ্খলতার আমোদের জন্যে এঁরা উচ্ছৃঙ্খলতা করেন না, চিত্তের লঘুতা কম। অথচ প্রেমের বেলায় সমানই অস্থির ও অবিশ্বস্ত,—এঁদের প্রেমে কবলিত হবার দুর্ভাগ্য যে মেয়ের হয়, তার জীবনের ট্র্যাজেডি সামান্য নয়। হয়তো আরও বেশী, কারণ, যারা লঘু ও প্রবৃত্তিসেবী তাদের অন্ততঃ নিন্দাবাদ করেও খানিকটা হাল্‌কা হওয়া চলে, কিন্তু এঁদের যে তাও চলে না। (তোমার তিনি কি এই শ্রেণীর ?) এঁরা অন্যায় কর্ত্তে চান না, কিন্তু চিন্তাশীলতার গোলকধাঁধাঁয় এত বেশী জড়িয়ে পড়েছেন যে ন্যায় অন্যায়ের দিশা হারিয়ে ফেলেছেন। এঁরা ভালোবাসা কামনা করেন, কিন্তু ভালোবাস্‌তে জানেন না—অত্যধিক মননশীলতায় হৃদয় শুকিয়ে এসেছে। ভালোবাসা যখন পান, তখন তাকে সরল আনন্দে গ্রহণ করবার কৌশল জানেন না, তাকে বিজ্ঞানের কোঠায় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ কর্ত্তে কর্ত্তে অকস্মাৎ হয়তো আবিষ্কার করে বসেন—ভালোবাসার অস্তিত্বও নেই, মূল্যও নেই,

প্রয়োজনও নেই। সুতবাং প্রেম বন্ধন শিথিল হয়ে আসে, প্রেমিকাব মুখখানি ছায়ামূর্ত্তি হয়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু মস্তিষ্কেব বাজত্ব কায়েম হয় না, প্রয়োজন আসে, দেহ প্রাণেব প্রেবণা আবাব একদিন কবে অজান্তে খোঁচা দিতে থাকে, ভালোবাসা পাওয়াব জন্যে মনস্বী আবাব উন্মুখ হয়ে ওঠেন, আবার একজনকে আলিঙ্গনে বাঁধবাব আয়োজন কবেন। কিন্তু সে বাহুবন্ধনও স্থায়ী হয় না, আবাব খসে পড়ে যায়। কাবণ, ভালোবাসা পবিপুষ্ট হওযাব অনুকূল মৃত্তিকাই তাঁদেব জীবনে নেই, ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজমেব প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে সমস্ত বস শুকিয়ে আকাশেব শূন্যতায় মিশে গেছে। বাস্তবিক এই আলেয়াবিলাসীদেব দেখে আমাব ক্ষণে ক্ষণে একান্ত করুণা জেগে ওঠে। এঁবা যে-মেয়েদেব জীবনে আবির্ভূত হন, তাদেবই যে শুধু অসহায় বিক্ত কবে দিয়ে চলে যান তাই নয়, এঁদেব নিজেদেবই জীবন এক একটি মহাশূন্য বিরাট্ ট্র্যাজেডি। ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজম্ বর্ত্তমান সভ্যতার কঠিনতম ব্যাধি, এবং তাবই একদিক্‌কাব পবিণতি এই এঁবা। ইন্‌টালেক্‌টেব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীব বাইবেকাব বিপুল পবিসবেব মধ্যে যাব স্থিতি ও গতি, সেই প্রেম ও পূর্ণতাকে আযত্ত কববাব দুরাশায় এই সুধীজনেবা ইন্‌টালেক্‌-টেবই দেযালে মাথা খুঁড়ে মবছেন। কিন্তু তাতো সফল হবাব নয়। ফলে দাঁড়িয়েছে, একটা সর্ব্বব্যাপী নৈবাশ্যবাদিতা ও শ্রদ্ধাহীনতা—যাব ছাপ আজকাল পৃথিবীব সব তথাকথিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পাতায় পাতায় দেখ্‌তে পাচ্ছি।

বলতে বলতে হয়তো অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। তবু একটু ধৈর্য্য ধব, আবও একটি কথা বলে নিই। আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে

নারী

একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না,—এর সমস্তটাই নারী পুরুষের প্রেম কাহিনীতে ছাওয়া, কিন্তু নারীর প্রেমের সম্বন্ধে কী এক বিস্ময়কর অশ্রদ্ধার ভঙ্গী। নব্য সাহিত্যিকদের রচনা থেকে তুমি বোধহয় একটি লেখাও বার কর্ত্তে পারবে না, যাতে মেয়েদের ভালোবাসা অথবা মেয়েদের জীবনের প্রতি একটি গভীরতর ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি-ভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়। প্রাচীন পুরুষের যে মনোভাব নারীকে নরকের দ্বার রূপে অপমান করে এসেছে, সভ্য যুগের নব্য পুরুষের মনও তার থেকে এক ধাপ এগোয় নি। বাইবের বহু ঘষা মাজাতেও কয়লা হীরে হতে পারলো না। অথচ আশ্চর্য্য, আমাদের শিক্ষিত মেয়েরা বিনা বাক্যব্যয়ে শুধু এগুলো হজম করে যাচ্ছে তা নয়, পুরুষদের দেখাদেখি এই সাহিত্যের তারিফও করে, এবং এই সব সাহিত্যিক ও সিউডো-সাহিত্যিকদের সঙ্গেই প্রেম কর্ত্তেও দ্বিধা বোধ করে না।

যাক্, হয়তো এসব অবান্তর কথা। কিন্তু এর ফলে আমাদের চার পাশে অসংখ্য মেয়ের জীবনে যে নিষ্করুণ ব্যর্থতা এসে হানা দিচ্ছে সেগুলো তো অবান্তর নয়। কেন এমনতর হতে পারছে? পুরুষ তার প্রেমে নিষ্ঠা আনবার চেষ্টা মাত্র করে না, অথচ পুরুষের খেয়াল অনুযায়ীই প্রেমের পরিণতি হবে, এমন হয় কেন বল দেখি? নিজের মনকে পরখ করে একবার তলিয়ে ভেবে বল।

আমার মনে হয়, এর জন্যে আংশিকভাবে দায়ী মেয়েরা নিজেরা। মেয়েদের মধ্যে এমন একদল আছে—(পক্ষপাত করব না)—যাদের পুরুষদেরই মত ভোগী মন, প্রজাপতিবৃত্তি কর্ত্তে যারা হর্ষ উপভোগ করে। তারা ত ইন্ধন যোগাচ্ছেই। তাদের কথা ছেড়ে দিলাম

(আশা করি তারা মুষ্টিমেয়)। কিন্তু যারা তোমার মত ভালো মেয়ে, দোষ তাদেরও আছে। নিজের অগোচরে অজান্তে আধুনিক পুরুষদের হাল্কা প্রেমলীলার প্রশ্রয় তারাও সতত দিয়ে আস্‌ছে। আজকাল পথে, ঘাটে, বাজারে, পুরুষের হাতের কাছে মেয়ে বড় সুলভে মেলে, বিশেষতঃ শিক্ষিত মেয়ে—যাদের সঙ্গে দু'দণ্ড ইংরাজী উপন্যাসের আলোচনা চলে, একত্র সিনেমা উপভোগ করে আরাম পাওয়া যায়, এবং একটু হাসির ইঙ্গিতে, গায়ে-পড়া একটুখানি আত্মীয়তায় তাদের প্রেমও মেলে। (আমরা তাই, বড় বেশী প্রেমলোভাতুর। ছেলেবেলা থেকে শুধুই প্রেমসর্ব্বস্বতার শিক্ষা পেয়ে আসি কিনা, তাই)। সুতরাং পুরুষের পক্ষে ভাবনা করবার আছেই বা কি ? প্রেমে নিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্যে তারা মনকে শৃঙ্খলিত কর্ত্তে যাবে কেন ? একথাটি শুধু লঘুস্তরের ছেলেদের সম্বন্ধেই নয়, যাঁরা ইনটেলেকচুয়াল্ বলে উচ্চস্তরের সম্মান পাচ্ছেন, তাঁদের সম্বন্ধেও বলছি। কেন না, তাঁরা যে প্রেমের ইনটেলেকচুয়ালাইজেশন ও ভাববিলাসিতা করে থাকেন, প্রেম সম্বন্ধে তাঁদের যে ফ্যাসটিডিয়াস্‌নেস্ দেখতে পাই, তা এতখানি সম্ভব হত না, যদি নারীর প্রেম দুর্ল্ভ হত। তাঁরা জানেন, আজ যাকে ভালোবাসলেন তাকে বিবাহ করবার কিংবা তার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত দায়িত্ব রাখবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ, উপেক্ষায় অনাদরে আজকের প্রেমিকাটি যদি বা আল্‌গা হয়ে যান, তবু আবার যখন অবসর বিনোদনের জন্য একটি নারীর সান্নিধ্য দরকার হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন অনায়াসেই হাতের কাছে যে-কেউ একজনকে পাবেন। এই নিশ্চিন্ততা আছে বলেই তাঁরা খেয়াল সুখে প্রেমকে শিথিল করে দিতে সাহসী হন ,

প্রিযাকে পত্নীত্বেব গৌববে বহন কববাব পবিবর্ত্তে 'বান্ধবী'ব দলে ঠেলে দিয়ে দাযমুক্ত। আজ আমাদেব প্রেম লাভ কববাব জন্যে ওদেব কোনও সাধনাব প্রয়োজন হয় না, তাই তাব মূল্যও নেই কিছু। যা দুষ্প্রাপ্য, তাবই দাম বেশী।

ওবা যে আমাদেব শ্রদ্ধা কবে না, তাব কাবণও এই। আমবা এত শস্তায দু'হাতে প্রেম বিকীর্ণ কবছি, যে তাব প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হবাব কোনও অবকাশই ওদেব দিই নি। এযে জীবন-বত্নাকবেব অতল-তলা থেকে আহবণ-কবা কৌস্তুভমণি, সে কথা ওবা জানে না, ওবা ভাবে,—পথ চল্‌তে ঘাসেব ফুল, খুসীমত তুলে নিলেও চলে, দলে গেলেও চলে।

সত্যি, আমাদেব মেযেবা এত বেশী প্রেমাকুল যে তাব ফেনায় সমস্ত বুদ্ধি বিচাব আচ্ছন্ন কবে ফেলে, যাচাই কবে পবখ কবে দেখবাব ধৈর্য্য নেই। কিন্তু বন্ধু, এমন কবে আব কতদিন চল্‌বে? দেখে শিখতে পাবলে না, এখন ঠেকে শিখবাব সময এসেছে। তুমি জিজ্ঞাসা কবেছিলে, তোমাব বেদনাব প্রতীকাব কি নেই? আছে বৈ কি? নিজেব অন্তবেব দিকে চোখ খোল, আব নিজেব মেরুদণ্ডকে একটু খাড়া কবে তোল। আমবা যাবতীয শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানেব তথ্য এযাবৎ পুরুষের কাছ থেকে শুনে শুনে শিখে এসেছি। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই থাক্। প্রেম সম্বন্ধে ও নিজেব জীবন সম্বন্ধে পুরুষেব কাছ থেকে শিক্ষা মুখস্থ কবাব দবকাব নেই। ববঞ্চ অনুবোধ কবি, পুরুষেব উক্তিতে, যুক্তিতে, সাহিত্যে, শিল্পে নাবীব প্রতি যে অশ্রদ্ধাময কামনাব ইঙ্গিত তোমাকে নিজেব প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও নিজেব কাছে

দুর্ব্বল করে রেখেছে, সেগুলো একবার ভুলে যেতে পারো? নারীর ভালোবাসা সম্বন্ধে পুরুষের লেখা থীসিস্ থেকে বিদ্যা ধার করে নিজেকে পরের চোখে দেখো না। তাহলে তোমার নিজের আসল রূপ দেখতেই পাবে না। আমি বলি, ওদের বাক্যের ইন্দ্রজাল দিয়ে মনকে আবৃত না করে, তার চেয়ে নিজেকে সত্যভাবে জেনে নিয়ে সবলভাবে সেই সত্যটি তাদের জানিয়ে দাও। নারীর জীবন সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তই নির্ভুল, এবং প্রেম সম্বন্ধে আমাদের বাণীই চরম-বাণী, কারণ, প্রেমের রাজ্যে নারীর একটি বিশেষ শক্তি ও অধিকার আছে যা পুরুষের নেই। কিন্তু আমাদের মেয়েরা বোবা, কথা বলে না, কেবল শুনে যায়। তারা বড় ভীরু, যাকে সত্য বলে জান্‌ছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে না, অন্যের খেয়াল মেনে নেয়।

তুমি হয়তো এ দীর্ঘ পত্রখানি পড়ে অধৈর্য্য হয়ে উঠছ, ভাবছ, এ কেবল কতগুলো থিওরেটিক্যাল্ জল্পনা, তোমার বাস্তব বেদনার প্রতীকারের কোনও সন্ধান মিল্‌লো না। কিন্তু আমি জানি, যদি নারীর ভালোবাসার অমর্য্যাদা ও ব্যর্থতার প্রতীকার কখনও হয়, তবে এই পথেই হবে, পুরুষকে অনুনয় করে নয়। খোসামোদে ভালোবাসা মেলে না, উচ্ছিষ্ট রুটির কণা মিলতে পারে। নিজের প্রেমের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শক্তির আস্বাদ যদি পাই, পুরুষের অবজ্ঞা, লঘুতা ও উন্মত্ত চপলতার হাত থেকে অব্যাহতি তখন পাবই।

জানি সে দিন আসবে। অনাগত ভবিষ্যতের সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

তোমার অনুমতি নিয়ে চিঠিখানা ছাপতে দিলাম। তুমি ত একা নও, তোমাব মত প্রবঞ্চিত ভালো মেয়ে আমাদের চাবপাশে আজ আবও কত যে আছে—হয়তো এ চিঠি তাদের একটুখানি কাজে লাগতে বা পারে।

আমাব ভালোবাসা নিও। ইতি—

নারীজীবনের প্রকৃত সমস্যা

শুধু আমাদেব দেশে নয়, পৃথিবীব সর্ব্ব সভ্যসমাজেই নারীজাতি সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ নানা সমস্যা দেখা দিতেছে। মনে হয়, পুবাকালে এতটা ছিল না। তখন সমস্যা অল্প স্বল্প যাহা ছিল, তাহা অন্যরূপ। তখন ভাবনা ছিল, নারীরূপী সম্পত্তিটিকে কেমন কবিয়া লোলুপ আততায়ীব কবল হইতে বক্ষা কবা যায়, উপায় উদ্ভাবন কবা হইল তাহাকে অববোধে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া,—ল্যাঠা চুকিয়া গেল। সমস্যা ছিল, নাবীকে গৃহেব মধ্যে কোন্ পর্য্যায়ে আসীন কবাইয়া কোন্ কর্ম্মে নিবত বাখিলে সমাজের অর্থাৎ পুরুষসমাজেব পক্ষে সুবিধা হইবে, মনু পবাশবাদি নানা সূত্র গাঁথিয়া গেলেন—নিরুপদ্রবে সমাজ ও পবিবাব চলিল।

কিন্তু বর্ত্তমানেব নাবীসমস্যা নূতন আকার ধাবণ কবিয়াছে। এতকাল সমস্যা উৎসাবিত হইয়া আসিতেছিল প্রধানতঃ পুরুষেব স্বার্থেব উৎস হইতে, সমস্যাব সমাধানও আসিয়াছিল পুরুষের বিচার বুদ্ধি হইতে। নারীর কল্যাণেচ্ছা লইয়াও যে সকল বিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহাবও প্রণেতা ছিল পুরুষ। যাহাকে লইয়া সমস্যা, সে ছিল অকিঞ্চিৎকব, গৌণ। নিজেব ভাবনা লইয়া নারী নিজে কখনও মাথা ঘামায় নাই। আজ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাব নিজের মনে, নিজেবই অভ্যন্তবে দোলা লাগিয়াছে। নাবীনামক যে

সামগ্রীটির সদ্ব্যবহার লইয়া পুরুষমনীষিগণ কর্তৃক যুগে যুগে গবেষণা হইয়া আসিতেছিল, সেই সামগ্রীটির অন্তরে কোথা হইতে চেতনা-সঞ্চার হইয়াছে, সে আর পরের হাতে নাড়াচাড়া ভালোবাসে না। তাই সমস্যা কিছু নূতনতর।

আমাদের চারিপাশে বর্ত্তমান জগতে নারীসম্পর্কিত কয়েকটি সমস্যা স্থূলভাবে দেখিতে পাই। সে চায় জ্ঞানের প্রসার, গতিবিধির প্রসার, বিবাহে স্বাধীনতা, বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিবার স্বাধীনতা, কর্ম্মে স্বাধীনতা, অর্থে ও বিত্তে পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ,—এক কথায় বলিতে গেলে, নিজের জীবন যাত্রার চারি পার্শ্ব হইতে সর্ব্বপ্রকার বাধা ও দীনতার অপসারণ। ভাবিতে গেলে সমস্যা ইহার কোনটিতেই থাকার কথা নয়, কারণ, দাবীগুলি মানুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। কিন্তু নারী যে স্বতন্ত্র মানুষ, এতকালের জগৎ এ ধারণায় অভ্যস্ত নয়, সুতরাং সে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছে। নারী যে পুরুষেরই মত একটি সচেতন সজাগ মন লইয়া তাহার সাম্নে আসিয়া পাওনা দাবী করে, ইহা পুরুষ প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতেই পারে না, যদি বা করে তো স্বীকার করিতে মন সরে না। কারণ, এ দাবী মিটাইতে গেলে তাহার অভ্যস্ত সংস্কার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং স্বার্থের গোড়ায় টান পড়ে, এবং বহুকালার্জ্জিত সভ্যতার প্রভাবেও অধিকাংশ পুরুষের মন আজও অতটা উদার ও সংস্কারমুক্ত হয় নাই। সুতরাং নারীর মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ তাহার কাছে যেমনই একটি হেঁয়ালির মত হইয়া দেখা দিয়াছে, মনুষ্যোচিত দাবীগুলিকেও তেমনই সমস্যা বলিয়া ঠেকে। ইহা পুরাতনের উপর নূতনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ইহাতে আমাদের

মনে ধাঁধাঁ লাগে না। কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীগুলি অন্তর হইতে উৎসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নারীর নিজের সম্বন্ধে নিজেরই যে এক গভীর সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ রহস্যময় ও জটিল। সেইদিকেই আজ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আজ জগৎজোড়া যতদিকে আরও যত সমস্যা দেখিতে পাইতেছি, রাজায় প্রজায়, ধনিকে শ্রমিকে, সকলেরই মূল কথা একই। স্বাধিকার লইয়া চেতনে চেতনে সংঘাত। একদিকে বহুকালের সুপ্তচেতন শ্রেণীগুলি বিবর্ত্তমান বিশ্বচৈতন্যের জীয়নকাঠিতে প্রাণ পাইতেছে, অপরদিকে সুখাভ্যস্ত পুরোগামী শ্রেণীবৃন্দ সে প্রাণের দাবী অস্বীকার করিতে চায়।

কিন্তু ধনিকে শ্রমিকে, রাজায় প্রজায় যে দ্বন্দ্ব, তাহা অপেক্ষাকৃত সরল, নারীপুরুষের দ্বন্দ্বের মত অত জটিল নয়। কারণ, তাহার লক্ষ্য স্পষ্ট এবং বৈরিতার মধ্যে অন্য কোনও ভাবের ভেজাল নাই। যে সম্পৎ রাজা পুঁজি করিয়া বসিয়া আছে, বঞ্চিত শ্রেণী সেই সম্পদে নিজেকে পুষ্ট করিতে চায়, কাড়িয়া আনিতে পারিলেই সে জয়ী ও তৃপ্তকাম। কিন্তু নারীর লক্ষ্য আদৌ তাহা নয়, কাড়াকাড়ি করিতে সে আনন্দ পায় না, পুরুষকে অর্থে, ক্ষমতায়, প্রতিপত্তিতে পদানত করিয়া রাখিতে সে উৎসুক নয়। আপনার নব-বিকসমান আত্মচৈতন্যের প্রেরণায় সে আপন স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু পুরুষের প্রতি আন্তরিক যে প্রেমানুভূতি, তাহা তাহাকে বারংবার সংগ্রামের পথ হইতে বিরত করিতে চায়। নারীর নিজের কাছে নিজের জীবনের সমস্যা কেন্দ্রগত

হইয়াছে এইখানে। ইহাই বর্ত্তমান নারীজীবনের অসঙ্গতি। যদি পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নারীর কাম্য হইত, তবে সমস্যা সহজ ছিল, একাগ্রমুখী চেষ্টার দ্বারা পুরুষের স্বার্থোদ্ধত অবিচারকে পরাস্ত করা কঠিন হইত না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার প্রকৃতির এক দিক্ তাহাকে যেদিকে উদ্বোধিত করিতেছে, অন্য দিক তাহার বিপরীত পথে টানে। সে যাহা চায়, তাহা এত পরস্পরবিরোধী যে, সুসঙ্গত সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। তাহার নিজেরই অভীপ্সা আজ দ্বিধাবিভক্ত। ইংরাজী মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় বলিতে গেলে, নারীর দ্বন্দ্ব আজ Ego vs. Sex , প্রচলিত ভাষায় বলিতে পারি—স্বাতন্ত্র্য ও প্রেম।

Ego ও Sex, এই দুইটির অসামঞ্জস্য ও পরস্পরসংঘাতের ফলেই মানুষের ব্যক্তিজীবনের অধিকাংশ সমস্যা ও বৈকল্যের উদ্ভব হয়, একথা বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিয়াছি এবং ইহা পুরুষনারীনির্ব্বিশেষে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু পুরুষের জীবনে এই সংঘাতের যে সমস্যা, নারীর জীবনে তাহার চেয়ে অন্যরূপ। নবনারীর মিলনোৎসবে প্রাকৃতিক নিয়মে পুরুষ প্রবলের ভূমিকা গ্রহণ করে, নারী আনন্দলাভ করে তাহার আনুগত্যে। এই কারণেই পুরুষের যৌন-সফলতার সঙ্গে অহঙ্কারের কোনও বিরোধ নাই, কিন্তু নারীর জীবনে বিরোধ পরিস্ফুট। মিলনের আনন্দ তাহাকে পুরুষের কাছে নতিস্বীকার করিবার প্রেরণা দেয়, অপরদিকে বিকাশের আহ্বান তাহাকে স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে ঠেলিয়া দেয়। এ সমস্যা পুরুষের নাই। তাহার স্থূল অহঙ্কার ও স্থূল যৌনানুভূতি একই দিকে তাহাকে চালিত করে।

নারীর যৌনস্পৃহার মধ্যে এই আনুগত্যের বীজটি নিহিত আছে বলিয়াই তাহার জীবনে প্রকৃত প্রেমের স্ফুরণ এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ প্রেমধর্ম্মের মূল ভিত্তি—আত্মত্যাগ। তাহা নারীর প্রকৃতিবিহিত মৌলিক উপাদানের মধ্যেই জড়িত বলিয়া তাহার স্থূল মিলনস্পৃহা হইতেও জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে অনাবিল ভালোবাসা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, পুরুষের মধ্যে উহা অহঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উগ্র বাসনাতে সীমাবদ্ধ, আজও তাহার মন যথার্থ প্রেমের শোভা লাভ করে নাই। কিন্তু এই বৈষম্যেই বিপদ্ হইয়াছে অনেক। নিজের মনে প্রেমের ন্যূনতাহেতু পুরুষ নারীর প্রেমের মর্য্যাদা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। নারীর ভালোবাসা তাহাকে আরাম দেয়, তৃপ্তি দেয়, আনন্দ দেয় এবং অহঙ্কারকে পুষ্ট করে, সুতরাং ইহা তাহার কাম্য। অতএব নারীর এই প্রেমকে নানা বাক্যালঙ্কারে সাজাইয়া, নানা শাস্ত্রানুশাসনে বাঁধিয়া নারীর একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেও শতমুখ হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে শ্রদ্ধা করে নাই। প্রেমমূলক এই আনুগত্য ও আত্মত্যাগকে পুরুষ মনে করিয়াছে দীনতা ও অক্ষমতা। অবজ্ঞা ও অপব্যবহার দ্বারা ইহার অপমান করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

হয়তো তাই নারীর ব্যক্তিত্বে তিলে তিলে আঘাত বাজিতে বাজিতে এত যুগ পরে বিদ্রোহের সুর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিচেতনা যতকাল সুপ্ত ছিল, ততকাল পুরুষের পায়ে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া প্রতিদানে তাহার তরফ হইতে শুধুমাত্র ক্ষণিকের আদর সোহাগ অঙ্গস্পর্শ লাভ করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছিল।

পুরুষের মনের সম্বন্ধে খোঁজ করে নাই। তাই পুরাযুগে পুরুষের বহু বিবাহ নারীর মনে জুগুপ্সা জাগায় নাই, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় তাচ্ছীল্য ও অসম্মান সহিয়াও স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হইতে সে অগৌরব বোধ করে নাই। (অন্ততঃ সেরূপ পরিচয় আমরা পাই নাই, তদানীন্তন নারীর অর্দ্ধসুপ্ত সসঙ্কোচ চেতনা তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় নাই)। কিন্তু আজ নারীমন তাহাতে তৃপ্ত নয়। আপনার মধ্যে যেমনই সে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অমনই তাহার প্রেমব্যাকুলতা রূপ বদলাইল। সে আর শুধু দেহসুখ লইয়া সুখী হইতে পারিতেছে না, তাহার প্রাণ পুরুষের দিক্ হইতে প্রতিপ্রাণ খুঁজিয়া ফেরে। সে আজ চাহিতেছে—তাহার আনুগত্যের বিনিময়ে করুণা, অনুকম্পা ও সোহাগ নয়, তাহার প্রেমের মহিমার প্রতি পুরুষের আন্তরিক আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা। তাই বহুবিবাহ ও প্রেমহীন বিবাহ স্বীকার করিতে বর্ত্তমানের নারী নারাজ; তাই জ্ঞানে ও কর্ম্মে স্বাধীন প্রসার আজ তাহার কাম্য, কারণ সে জানিয়াছে, ইহা ব্যতীত পুরুষের সমান ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যাঁহারা বর্ত্তমান নারী সমাজের জ্ঞানার্জ্জনের দাবী, উপার্জ্জনের দাবী, স্বাধীন বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী প্রভৃতি সমরাভিযান দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছেন, তাঁহাদের এইখানে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা যাহাকে অস্বাভাবিক পুরুষবিদ্বেষ অথবা পুরুষানুকরণ মনে করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক নারীপুরুষে যথার্থ শ্রদ্ধামূলক সখ্য স্থাপনেরই আন্তরিক উদ্যোগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নয়, স্বভাববিকৃতিও নয়। প্রেমকে মুছিয়া ফেলিয়া চণ্ডী বা শিখণ্ডী হইবার সাধ নারীর মনে জাগে

নাই, প্রেমকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবারই আয়োজন। পুরাকাল ও আধুনিক কালের দৃষ্টি ভঙ্গীর পার্থক্য শুধু এইটুকু,—আজ নারীর মনে এই ধারণা জাগিতেছে, যে, প্রেম নারীজীবনের তথা সকল মানবজীবনেরই সুন্দরতম সম্পৎ, কিন্তু অখণ্ড আত্মার চেয়ে বড় নয়। দুর্ব্বল প্রেমপিপাসার পায়ে আত্মাকে বলি দেওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নয়, আত্মপ্রত্যয়শীল সবল প্রেম বিতরণের দ্বারা নিজের ও পরের জীবনকে মহীয়ান্ করিতে হইবে।

কিন্তু নারীর পক্ষে ইহা একটি বিষম উদ্যোগ। যাহাকে ভালোবাসিতেছে এবং যাহার ভালোবাসা আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাহারই বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ কথা নয়। প্রেমকে জীবনের একটি সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্য বলিয়া জানিযাও জীবনদেবতাকে অপমানের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রেমহীনভাবে কঠোর বিদ্রোহে যুঝিতে হইবে, এ এক অভাবনীয় পরিস্থিতি। বর্ত্তমানযুগের নারীসমাজ আজ পড়িয়াছে এই সমস্যারই মধ্যে। তাই কেহ এদিক্ দোলে, কেহ ওদিক্। হয়তো অধিকাংশ নারী লক্ষ্য ও পথ এখনও নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি ইংরাজী প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম, লেখক নারীজাতিকে চারিটি চরিত্রলক্ষণ অনুসারে চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন—জুনো (Juno), ভিনাস (Venus), ডায়েনা (Diana) ও সাইকী (Psyche)। বিভাগটি ভালো লাগিয়াছিল এবং আমার মনে হয়, নারীজাতির ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসকেও ঠিক এই চারি যুগে বিভক্ত করা চলে। জুনো ও ভিনাসের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে আদিম ও মধ্যযুগীন নারীর সঙ্গে সঙ্গে। আজ আসিয়াছে ডায়েনার

যুগ। আদিমে নারীর মধ্যে পরিস্ফুট ছিল ছলাকলাময়ী উলঙ্গ কামনা, তারপরে আসিল একান্ত আনুগত্য ও আত্মবিস্মরণ, আজ তাহার জীবনে স্বাধীন আত্মচেতনা জন্ম লইয়াছে, দীন ভিখারিণীর বেশে পুরুষের পায়ে ধর্ণা দিতে আজ তাহার রুচি নাই, সে নিজের উপরে স্বতন্ত্র দাঁড়াইবার নব আস্বাদ লাভ করিয়াছে। তাই স্বতন্ত্রতার দিকে আজ তাহার গতি।

কিন্তু মনে হয়, এখানেই নারীর অগ্রগতির পরিণতি নয়। পুরুষের প্রেমবিহীন স্থূল স্বার্থবুদ্ধিকে নাড়া দিয়া মতি ফিরাইবার জন্য সমাজ-বিবর্ত্তনের পথে এ একটি অপরিহার্য্য বিভ্রাট,—তাই ঘটিয়াছে। কিন্তু বিগতযুগে যেমন নারীর ভালোবাসা মেরুদণ্ডহীন হইয়া দাসত্বে পরিণত হইয়াছিল, যদি বর্ত্তমানের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস স্থূল অহঙ্কারে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলেও তেমনই আর একটি মারাত্মক ভুল হইবে। নারীর পক্ষে জীবনের পূর্ণতম বিকাশের পথ দেখিতে পাই একটি,—তাহার স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে অবনত করিয়া প্রেমাকুলতার দ্বারা নিজেকে আচ্ছন্ন করাও নয়, প্রেমকে নিষ্পেষিত করিয়া অহঙ্কারমূলক শুষ্ক স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করাও নয়, প্রেম ও স্বকীয়তাকে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সূত্রে গাঁথিয়া একটি নূতনতর নারীজীবনের আবির্ভাব করা, যাহার রূপ জগৎ আজও দেখে নাই। হয়তো অন্তরগৌরবে উজ্জ্বল, শ্রীমণ্ডিত এই মূর্ত্তিকেই আমরা বলিতে পারি সাইকী।

কিন্তু এই মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইবার পথটি বড় শক্ত—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা।

সমাপ্ত